আশুতোষ
কলেজ
পত্রিকা
প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।

“যেতে নাহি দিব”

প্রয়াত প্রাক্তন

অধ্যাপক, অধ্যাপিকা

ও

শিক্ষাকর্মী

“লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম অনেক দিয়েছি”

শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে

আমাদের সংহতি একত্রিত করতে গিয়ে

যাঁরা শহীদ হয়েছেন

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

২০০৩

ASUTOSH COLLEGE LIBRARY
ESTD-1916

৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৬
ফোন নং ঃ ২৪৫৫ ৪৫০৪

উপদেষ্টা ঃ
অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ
শ্রী অমলকান্ত চক্রবর্তী, শ্রী মোহিনী মোহন আদক, শ্রী অশোক কুমার রায়, শ্রী অংশুতোষ খাঁ,
শ্রী রমেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমতী রাইকমল দাশগুপ্ত, শ্রীমতী চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, শ্রীমতী শ্রাবণী রায়,
শ্রী ভাস্কর মৃধা, শ্রীমতী সুধা গুপ্তা

যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদক ঃ
শমীক বিন্দু, শঙ্খদীপ ঘোষ

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ
শতাব্দী সামতানি, অনুমিত্রা ঘোষদস্তিদার, সুমন্ত চ্যাটার্জী, সৌরভ নন্দী

কর্মাধ্যক্ষ ঃ
সায়ন্তন সরকার, শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত

বিশেষ কৃতজ্ঞতা ঃ
শ্রী সুদীপ চন্দ্র, শ্রী সায়ন্তন সাহা, শ্রী সায়ন্তন সরকার, শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত, শ্রী অরিন্দম বোস,
শ্রী দেবমাল্য দাসগুপ্ত, শ্রী সুমন্ত চ্যাটার্জী, শ্রীমতী শতাব্দী সামতানি, শ্রী দীপ্তময় দাস, শ্রীমতী সুদীপ্তা দাস,
শ্রীমতী শাঁওলী দাস, শ্রী সৌরভ নন্দী, শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য, শ্রী সজল বসাক, শ্রী রাণা সাহা,
শ্রী কৌস্তভ চ্যাটার্জী, শ্রী রাহুল কানুনগো, শ্রী শুভাশিস কুমার দে

প্রচ্ছদ ঃ সৌরভ নন্দী

প্রকাশক ঃ অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

মুদ্রক ঃ সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২
ফোন ঃ ২২৩৬-৬৪৯৯/

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

বর্ষ ঃ ২০০২-২০০৩

সভাপতি
অধ্যাপক শ্রী অশোক কুমার রায়

সহ-সভাপতি
সায়ন্তন সাহা

সাধারণ সম্পাদক
সুদীপ চন্দ্র

সহ-সাধারণ সম্পাদক
শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত
সায়ন্তন সরকার

যুগ্ম-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শাঁওলী দাশ
সুমন্ত চ্যাটার্জী

সহ-যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক
তিথি আম্বলী
সুদীপ্তা দাস

যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক
অরিন্দম বোস
দীপ্তময় দাস

সহ-ক্রীড়া সম্পাদক
অভিষেক রায়

গ্রন্থাগার সম্পাদক
প্রমিত বসু

যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদক
শমীক বিন্দু
শঙ্খদীপ ঘোষ

কমনরুম ও ক্যান্টিন সম্পাদক
ইন্দ্রজিৎ কারার

ছাত্রী-কমনরুম সম্পাদক
অরুন্ধতী সরকার

ছাত্রাবাস সম্পাদক
মুস্তাক মহম্মদ

অন্যান্য সদস্য
দেবমাল্য দাসগুপ্ত
অনুমিত্রা ঘোষ দস্তিদার
দীপঙ্কর দাস
সুপ্রতীক রায়
শুভম পুততুণ্ড

সূচীপত্র

■ সম্পাদকীয়		6
■ সাধারণ সম্পাদকের কলমে	সুদীপ চন্দ্র	7
■ ওরা কোথায় যাবে	অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত চৌধুরী	8
■ ছাত্র সংসদের সভাপতির কলাম	অধ্যাপক অশোক কুমার রায়	9
■ জল-টল নিয়ে কিছু কথা	অধ্যাপক অংশুতোষ খাঁ	10

কবিতা

■ স্বপ্ন দেখি	অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত	12
■ ড্রপ আউট	অধ্যাপিকা অরুন্ধতী চানক	12
■ শুধু ভাঙনের শব্দ নয়	অধ্যাপক অমলকান্ত চক্রবর্তী	13
■ আবিষ্কারের ছড়া	অধ্যাপক ডঃ দিলীপ কুমার সেন	14
■ তিন সত্যি—এক মিথ্যে	অনুজ গাঙ্গুলী	16
■ শিল্পী আমি	স্বাগতা নন্দী	17
■ মা	অদ্রিজা দত্ত	17
■ জন্মদিন	সুব্রত ঘোষ	18
■ নাগরিক	শ্রীজিৎ দাশ	18
■ সহজপাঠ	ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়	19
■ দুটি কবিতা	দেবব্রত মণ্ডল	20
■ তিতাস	শীর্ষেন্দু সেনগুপ্ত	21
■ শ্রাবণের গন্ধ আজ	প্রীতম ভট্টাচার্য	21
■ স্বার্থবাহক	দেবাঞ্জন মুখার্জী	22
■ যখন আঁধার নামে	দেবাশীষ ঘোষ	22
■ হাওয়া	শ্রীমন্তি মুখোপোধ্যায়	23
■ আজব খবর	সঙ্গীতা দাশ	23
■ যদি আর কোনও দিন...	শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত	24
■ নারী	শান্তনু দত্তগুপ্ত	24
■ আমি পারিনি	অভিজিত দাস	25
■ সিদ্ধান্ত তোমার	সৌরভ নন্দী	25
■ তামসী	তরুণ দত্ত	26
■ বাঁচতে চাই	রনজীব ঘোষ	27
■ জয় হিন্দুত্ব (নয়া)	শৌভিক গোস্বামী	27

সূচীপত্র

গদ্য

■ মার্কিনীদের প্রতি	সৌম্যদীপ বসু	28
■ দেশ ও দেশের নায়ক	সৌম্যজিত রায়	30
■ একটি পরিসংখ্যান—একটি বাস্তব —একটি প্রয়াস	দেবাশীষ ঘোষ	31
■ আদিবাসী তথা সাঁওতাল সমাজের জীবন	রিলামালা কিস্কু	32
■ হারিয়ে যাওয়া গল্পগুলি	পৌলমী চ্যাটার্জী	36
■ এতটুকু বাসা	অমিত চৌধুরী	38
■ স্বপ্নভূমি	ধৃতিকল্পা দাশ	39

Poetry

■ CROSSING BORDERS	Sibendu Chakraborty	40
■ "COME TO AN END"	Somnath Rai	40
■ FRIENDSHIP	Sunil Kumar Mishra	40
■ YOU, ME AND MARQUEZ	Rajeev Bhattacharya	41
■ TEACH THE WORLD TO SMILE	Pritam Chatterjee	41
■ SOMEONE MADE ME BELIEVE	Swagata Nandi	42

Prose

■ GRANNY'S DIARY	Swatilekha Bhattacharya	43
■ THE WHITE PACKET	Pritha Chattopadhyay	44
■ THE MIRACLE CURE	Samiuzzama Siddique	46
■ SHADOW OF GOD	Prasanna Kumar Das	47
■ "ADDA"	Arunima Dasgupta	48
■ TERRORISM IN KASHMIR	Sreemoyee Mukherjee	49
■ GLOBALIZATION— FOR THE RICH OR POOR	Nayana Bose	50

কবিতা

■ भाई-भाई	Shamshad Alam	53
■ कभी तो सुबह आएगी	Poulami Kar	53
■ हमारी चाहत	Soumani Banerjee	53
URDU WRITING		54

সম্পাদকীয়

"I have to be cruel only to be kind" আশুতোষ কলেজের ২০০৩ বার্ষিক পত্রিকার সম্পাদকীয় কলাম লিখতে বসে এর চেয়ে উপযুক্ত ভূমিকা পেলাম না। লেখাপড়া, খেলাধুলা ও বিনোদনের ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রছাত্রীদের যে কথাটি অবশ্যই মনে রাখা কর্তব্য তা হল সাহিত্য চর্চা। বুদ্ধির বিকাশে, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতায়, ভাষার উন্নয়নে ও সর্বোপরি একটি শিক্ষিত মনের অধিকারী হতে গেলে সাহিত্য চর্চা অপরিহার্য। পাঠ্য বিষয়ের ভিড়ে অবকাশ কমে এসেছে একথা সত্যি কিন্তু ভুললে চলবে না সাহিত্যই সেই মুক্ত আকাশ, যেখানে পাওয়া যাবে অবাধে অবতরণের অপূর্ব আনন্দ — সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে, বহুর মধ্যে বৈশিষ্ট্যময় এককে, জীবনের নানা ক্ষণের নানা অনুভূতির রস আস্বাদন করার এবং নিজেকে এই সবের মধ্যে অনুভব করবার বিস্তৃতি।

জীবন সীমাবদ্ধ, হয়ত (হয়ত কেন, সত্যিই তাই) সুযোগও সীমাবদ্ধ — কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে ঘরের কোনে থেকেও সেই সীমাবদ্ধতার গন্ডীকে ভাঙবার অমিত শক্তি। তাই সারা বছর পরীক্ষার খাতায় বইয়ের ভাব প্রকাশের পর, মনের ভাব প্রকাশের জন্য বোধহয় একটি জানালাই খোলা থাকে, তা কলেজ পত্রিকা। সবাই-ই চায় তার মনের গভীর অনুভূতির পাখিটি ঐ জানালা দিয়েই ডানা মেলে দিক। আমরা যারা পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত আমরাও তাই চাই। কিন্তু সে সাধ থাকলেও সাধ্যে তা কুলোয় না। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অপারগ। আসুতোষ কলেজ পত্রিকার একটি ঐতিহ্য আছে। সেই সনাতন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করেই শুধুমাত্র আমাদের বিচারে উত্তীর্ণ লেখাগুলিকে স্থান দিতে পেরেছি। তাছাড়া পত্রিকার আয়তন সীমাবদ্ধ। তাই অনেক সময় একাধিক লেখা ভালো লেগেছে, কিন্তু স্থান করে দিতে হয়েছে একটিকে। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের এই পত্রিকার গুণমান-এর প্রতি kind হতে গিয়েই তাদের অনেকের আশালতা নির্মূল করে cruel হয়েছি।

এ বছরটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বছর, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোধ হয় 'ইরাক পরিস্থিতি'। কিন্তু আশানুরূপ লেখা 'ইরাকের' ওপর পাইনি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সব চেয়ে বেশি লেখা পেয়েছি প্রেম বিষয়ক। তাতে অব্যক্ত প্রেম যেমন আছে, তেমন আছে প্রথম প্রেমের অভিব্যক্তি। এগুলি বেশিরভাগই নারী অথবা পুরুষ কেন্দ্রিক। তবে নির্ভেজাল প্রকৃতি প্রেমিকও কয়েকজন আছেন। তবে শুধু শব্দ বিন্যাসই মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়। রং-তুলিও অনেক সময় কথা বলে। পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিধিতে সেই বাঙ্ময়তাকে ধরে রাখার একটা প্রয়াসও রইল।

যাই হোক সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পত্রিকার কাজ শেষ করা গেছে। আমাদের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা ক্লাস রুমের বাইরেও যে আমাদের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ তা আমরা জানি। তাঁদের এবং কলেজের অন্যান্য সমস্ত শিক্ষাকর্মীদের সাহায্য ছাড়া পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হতনা। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হবে যদি আমার সেইসব বন্ধুদের কথা উল্লেখ না করি যারা এই কাজে আমাকে নিরলস সাহায্য করেছে। সাহায্য পেয়েছি সম্পাদকমণ্ডলী, সংসদের সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সংসদের অন্য সমস্ত সদস্য-সদস্যাদের কাছ থেকেও। পাশে পেয়েছি সেইসব বন্ধুদের যারা সংসদ বা সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত না থেকেও পত্রিকার অবিচ্ছেদ্দ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ধন্যবাদ তাদেরও যারা অন্তত মনে মনেও চেয়েছেন পত্রিকাটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হোক। ধন্যবাদ প্রাপ্য সমস্ত অগ্রজ ও অনুজ বন্ধুদের।

এবার ক্ষমা চাওয়ার পালা। ২০০৩ এর পত্রিকা পুজোর আগেই প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল সেরকম কথাও দিয়েছিলাম। কথা রাখতে পারিনি বলে ক্ষমাপ্রার্থী। ক্ষমাপ্রার্থী, অন্য কোন ত্রুটি সম্পাদনার কাজে ঘটে থাকলে তার জন্যও।

আর দীর্ঘায়িত না করে শেষ করছি। তবে tradition অনুযায়ী সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করতে হয়। কিন্তু—

"সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা
এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ মনে হয় শুভেচ্ছার কথা।"

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ভর্তির পরপরই জড়িয়ে পড়লাম ছাত্রসংসদের সঙ্গেও। দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা বছর নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় বর্ষে ছাত্রসংসদের নির্বাচনে জয়ীও হলাম। কাঁধের ওপর ন্যস্ত হল আশুতোষ কলেজের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও। এই বিরল সম্মান পাওয়ার পর ভয়ও পেয়েছিলাম কিছুটা। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল — পারবো তো এই গুরুদায়িত্ব সামলাতে?

আশুতোষ কলেজ কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান— বিরল এর ইতিহাস। আজ আশুতোষ কলেজ জাতীয় স্তরে নিজের জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। কলেজ NAAC-এর C++ স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে এর মান আরও উন্নত করতে হবে। UGC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী কলেজ আরও অন্যান্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে চিহ্নিত হয়েছে ও নানা অনুদান পেয়েছে এগিয়ে চলার জন্য। সমাজের বর্তমান অধ্যক্ষ ও কলেজের সাথে যুক্ত সকলের ঐকান্তিক প্রয়াসে শুরু হয়েছে উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমের নতুন নতুন শিক্ষা বিভাগ। সকলে জেনে খুশী হবেন যে কলেজ আরও সমৃদ্ধি লাভের আশায় নতুন ক্যাম্পাসও নির্মাণ করতে চলেছে ভাসাতে এবং বেহালায়।

প্রত্যেক বছরের মত এই বছরেও কলেজের নির্ধারিত নানা সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠানসূচী ছিল যা আশাকরি প্রত্যেকের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। এবছরই প্রথম কলেজের নবীনবরণ উৎসব নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য। কলেজ ফুটবল টিমের প্রদর্শন এ বছর আশানুরূপ না হলেও আশা রাখি, আগামী বছর আরও ভাল ফল পাওয়া যাবে, কারণ অনেক উঠতি প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার কলেজে ভর্তি হয়েছে।

অবশেষে আমি আমার প্রত্যেক ছাত্রবন্ধু, সহকর্মী ও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আমার সকল ছাত্রবন্ধুকে কলেজ সংসদের সাথে আরও আন্তরিকতার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই কারণ ছাত্রসংসদ চালানোর মূল কাণ্ডারীই হল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং সংসদের সব কাজকর্মই ছাত্রছাত্রীদের ঘিরে। যদিও সংসদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে হয়ত নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, নানা চড়াই-উৎরাই পথ পেরোতে হয়, কিন্তু ছাত্রছাত্রীবন্ধুরা যদি এগিয়ে না এসে সংসদের চলার পথের সাথে পা না মেলায় তাহলে সংসদ অচল হয়ে পড়বে।

সুদীপ চন্দ্র
সাধারণ সম্পাদক
আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদ

ওরা কোথায় যাবে

স্বাধীনতার পর ছাপ্পান্ন বছর পার হয়ে গেছে। স্কুল কলেজের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। বিশেষত বিগত ছাব্বিশ বছরে প্রাথমিক স্তর থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং শিক্ষা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পৌঁছেছে। এব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। রাজ্য বাজেটের সিংহভাগই ব্যয়িত হয় শিক্ষাখাতে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ঘটনা হল কলেজ জীবন থেকে স্নাতক স্তর ভালো ভাবে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আজও ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই সব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে শিক্ষাজীবন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়, অনেকে আবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বা বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য চলে যেতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রী বাইরে চলে গেলে একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ স্নাতকোত্তর স্তরে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থেকে পড়ার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়, আবার সেই সঙ্গে সামাজিক স্তরে এর একটা প্রতিক্রিয়াও রয়ে যায়। যেমন পশ্চিমবঙ্গের অর্থ বাইরে যাচ্ছে এবং সেখানে চাকরির সুযোগও তৈরী হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। একটা সাধারণ হিসাব দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আমার দীর্ঘদিনের শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি একটি বিষয়ে কোর্স চালু করলে অন্তত পক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী মিলিয়ে এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার দিনেও আট জন বেকার যুবক যুবতীর চাকরীর ব্যবস্থা করা যায়। এ ছাড়াও যে সব ছাত্র ছাত্রী ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চলে যাচ্ছে, তারা সেখানে যে পরিমান অর্থের বিনিময়ে পড়াশুনা করে তার থেকে অনেক কম খরচে এই রাজ্যেই পড়াশুনা করতে পারবে। এই প্রসঙ্গে নাম না উল্লেখ করেই বলি, কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলায় এমন অনেক কলেজ আছে যেখানে পরিকাঠামো রয়েছে এবং স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনা করার সুযোগ আছে। অনেক শিক্ষাবিদ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বলেন যে কলেজে এম.এ /এম.এস.সি পড়ানোর পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কোন বিতর্কে না গিয়েও আমি একটি বিষয়েই বলব, সেটা হল, প্রথমে কোথাও পরিকাঠামো সেইভাবে থাকেনা। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আমরা দেখি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম শুরু হয়েছিল পরিকাঠামো বাদ দিয়েই যা আজ মহীরুহে পরিণত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের গৌরব তাও শুরু হয়েছিল ছাতিম গাছের তলায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসও প্রায় সেই রকম। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম কলেজ আশুতোষ কলেজ। এর শুরুও ভাড়াবাড়িতে। আরেকটি উদাহরণ, খুবই অল্পদিনের ঘটনা—২০০২ সালে যখন আশুতোষ কলেজে পরিবেশ বিজ্ঞানে এম এস সি কোর্স চালু হয়েছিল তখন তেরো জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল। তাদের মধ্যে এম এস সি পার্ট ওয়ানে এগারো জন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত। এই পরিকাঠামো আমরাই তৈরি করে নিয়েছি।

যাই হোক, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা এগোতে চাই। এ ব্যাপারে আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। শুধু সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলেই চলবে না। নিজেদের প্রচেষ্টায়, সরকারের সহযোগিতায় ও অনুমতিতে নামী কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ার সুযোগ করে নিতেই হবে। সেটাই হবে এই সব ভালো ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমাদের একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম অঙ্গিকার। তা না হলে প্রশ্ন থেকেই যাবে, ওরা কোথায় যাবে—

অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

ছাত্র সংসদের সভাপতির কলাম

আশুতোষ কলেজ প্রগতিশীল চিন্তাধারার পথিকৃত। তাই এই মহাবিদ্যালয় গুণগত দিক থেকে তার অবয়ব বৃদ্ধি করে চলেছে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে আধুনিক চিন্তাভাবনা থেকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না, তাই নতুন নতুন বিষয়কে এই মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার পথকে উন্মুক্ত করতে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন পাঠনও শুরু হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী শিক্ষাবিদের অসহযোগিতায় আমাদের মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে আরও বিভিন্ন বিষয়ে পঠন পাঠন সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলেও অদূর ভবিষ্যতে সুস্থ মস্তিষ্ক শিক্ষাবিদ্‌দের সাধু প্রচেষ্টায় সেই বাধা দূর হয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে আরও নতুন নতুন বিষয়ের পঠনপাঠনের দ্বার উন্মুক্ত হবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে কেননা আশুতোষ কলেজ উচ্চতর শিক্ষাপ্রসারেরও দায়বদ্ধ। অধ্যক্ষের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাধারার মহামিলনে আশুতোষ কলেজ আজ বিশাল কর্মকান্ডের সম্মুখীন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যক্তিগত মালিকানায় গৃহদান মাধ্যমে বেহালায় একটি সুসজ্জিত বিশাল বাড়ী উচ্চ শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য আশুতোষ কলেজের বৃহত্তর অবয়বের অঙ্গ হতে চলেছে। ডায়মন্ডহারবার রোডের পাশে ভাষায় ৩২ বিঘারও বেসি জমি কেনা হয়েছে এবং সেখানে নতুন নতুন আধুনিক বিষয় পঠনপাঠনের জন্য পূর্ণ উদ্যমে কাজকর্ম শুরু হয়েছে। শত্রু-মিত্রের চাওয়া না চাওয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই নিজস্ব ঢঙেই এই মহাবিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য তার নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যা বিভিন্ন দৈনিক পত্রপত্রিকায় প্রায় নিয়মিতই প্রতিফলিত হচ্ছে এবং আমাদের প্রগতিশীল প্রচেষ্টা বারেবারেই উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। শিক্ষা প্রসার ও উন্নতিতে আশুতোষ কলেজ আজ সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় আমাদের মহাবিদ্যালয় 'CENTRE OF EXCELLENCE' এর মত দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আমাদের চলার পথ তাবলে সবসময়ই মসৃন হবে একথা ভাবার অবকাশ নেই। অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের চলার পথকে সুগম করে নেবই এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কলেজের আগামী দিনের শিক্ষার কাঠামো সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী করতে ছাত্রদের অপরিসীম ভূমিকার কথা উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করে না।

মহাবিশ্বের জনজীবন আজ ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসণী ভূমিকা ছাত্রদের কাছে তথা বিশ্বমানবতার কাছে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আমেরিকা শুধু কোনও যুদ্ধবাজ মহাদেশ নয়, এই দেশটি যুদ্ধপ্রিয় — সর্বোচ্চ ক্ষমতার জন্যে সে দুনিয়ার সব দেশেই খুঁজে ফিরতে পারে অনেকানেক সাদ্দাম অথবা তার কল্পিত খল নায়কদের, দুনিয়াকে তাঁবে রাখতে পাশে পেতে পারে ব্লেয়ারের মতো অনুগত প্রধানমন্ত্রীকে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী আওয়াজ তুলে ছাত্ররাই পারে আমেরিকার স্বৈরাচীর অভিলাষের চিরসমাপ্তি ঘটাতে।

ভারতের বিভিন্ন কোনেও বহুরকম বিপদ উঁকিঝুঁকি মারছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গুজরাটকে ক্ষতবিক্ষত করে প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তি এখনও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কিভাবে অন্যপ্রদেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজকে বপন করা যায়। এ ক্ষেত্রেও ছাত্ররা তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না, তাদের মিলিত প্রচেষ্টায় এই অশুভ শক্তির বিনাস সম্ভব।

কতিপয় বিপথগামী ছাত্র 'র‍্যাগিং' নামক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের সুস্থ ও সনাতন সামাজিক কাঠামোতে আঘাত হানছে। সমগ্র ছাত্রসমাজকে করছে কলুষিত এই অন্যায় কাজের সঙ্গে কোন আপোষ নয়, শক্ত হাতে এই ক্রিয়াকলাপকে প্রতিহত করতে হবে। ছাত্ররা এরকম কাজকে প্রতিহত করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ছাত্রসমাজ চিরজাগ্রত অগ্রগামী সৈন্যদল। এরা সমাজের সকল বন্ধন ছিন্ন করার জন্যে চির প্রতিশ্রুত। বিশ্বের ছাত্রসমাজের সেই একই ইতিহাস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অবারিত রক্তমোক্ষণ, নির্বিচার প্রাণদান — এসবের মধ্যস্ততায় তারা এক বন্ধনমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে, এবং সেই পৃথিবীকে বরণ করার জন্যে তারা সদা জাগ্রত। সমাজের জড়তাগ্রস্ত স্থবির অংশ লাভ লোকসানের অঙ্ক কষে, স্বার্থ সিদ্ধির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ছাত্রসমাজ প্রাণের উৎসাহে চিরচঞ্চল, স্বার্থত্যাগী দধীচির দল। সমাজের অন্যায়, অসত্য ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের চিরন্তন সংগ্রাম। যেখানে ব্যথা বেদনার হাহাকার, আর্তপীড়িতের ক্রন্দন রোল সেখানেই ছাত্রসমাজের নির্ভয় উপস্থিতি। আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে আশুতোষ কলেজের ছাত্রসমাজ সমাজের প্রতি ছাত্রদের মহান দায়িত্ব পালনে অগ্রনী ভূমিকাতেই থাকবে।

অধ্যাপক অশোক কুমার রায়
(সভাপতি, ছাত্র সংসদ)

জল-টল নিয়ে কিছু কথা

"কী অদ্ভুত ব্যপার — যে জল ছাড়া আমাদের চলে না, তার দাম সস্তা; আর যে হীরের প্রয়োজন নেই বললেই চলে, সেটা হলো দামী।

— অ্যাডম স্মিথ

জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কিন্তু জল নিয়ে সমস্যাও তো হওয়ার কথা নয়। কেননা আমরা ছেলেবেলা থেকেই জেনে এসেছি যে, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। কিন্তু সমস্যা হল যে, এই মোট জল সম্পদের সাড়ে তিন শতাংশেরও কম হল সুপেয় বা পানের যোগ্য জল। জনসংখ্যা বাড়ছে, আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে কমছে নিরাপদ পানীয় জলের পরিমাণ।

বর্তমান বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে রাষ্ট্রসংঘে প্রাকাশিত World Water Assessment Programme থেকে জানা যাচ্ছে যে, "আগামী কুড়ি বছরে জলের যোগান এক তৃতীয়াংশ কমবে। ২০২৫ সালে এই সঙ্কট এমন ভয়াবহ চেহারা নেবে যে, মাথাপিছু জল-চাহিদা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। নূন্যতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য দুই তৃতীয়াংশ মানুষের যথেষ্ঠ জল থাকবে না।" গত একশ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ, কিন্তু জলের ব্যবহার বেড়েছে ছয়গুণ। জল বাবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্যের চেহারাটাও চোখে পড়ার মত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একদিন মানুষ যেখানে ২৫০ থেকে ৩০০ লিটার জল ব্যবহার করেন, সেখানে সোমালিয়ার একজন করেন ৯ লিটারেরও কম। অথচ রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন প্রতিদিন ৫০ লিটার জল। এই বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটছে জনস্বাস্থ্যের উপর। পৃথিবীতে প্রতি আট সেকেণ্ডে জলবাহিত রোগে মারা যাচ্ছে একটি করে শিশু, ১০০ কোটি মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত আর ২৪০ কোটি মানুষের নেই স্যানিটেশনের সুযোগ। এদের প্রায় সবারই বাস তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে । ভারতের ক্ষেত্রে চিত্রটি কম ভয়াবহ নয়। ছত্রিশগড়, গুজরাট, ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশের কয়েক কোটি মানুষ ২০01 এবং ২00২ সালে ভয়ঙ্কর খড়ার কবলে পড়েছিলেন। এই সব জলাভাবী রাজ্যগুলোর ৮০ শতাংশ গ্রামীন মহিলারা ঘাড় আর কোমরের অস্থিসন্ধির নিদারুণ ক্ষয়ে ভোগে। দূর দুরান্ত থেকে অবস্থিত জলের উৎস থেকে জল আনতে গিয়ে ১৫ কোটি মহিলার শ্রম দিবস নষ্ট হয়ে যার ক্ষতির পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা। জলবাহিত রোগের কারণে প্রতিবছর ৯ কোটি শ্রমদিবস নষ্ট হয়। আমাদের দেশের ৮০ শতাংশ শিশু জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়—প্রতি বছর মারা যায় ৭০ হাজার শিশু।

সেই অ্যাডাম স্মিতের যুগ আজ অতিক্রান্ত। জল আজ সত্যিই মহার্ঘ বস্তু। ব্রিটিশ জল কোম্পানী টেমস ওয়াটারের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পিটার সিলেটের ভাষায় " একুশ শতকের পেট্রোলিয়াম হল জল।" সারা বিশ্বে জল ব্যবসার পরিমাণ এখন ৪০ হাজার কোটি ডলার এবং এই ব্যবসার বৃদ্ধির পরিমাণ বছরে ২০ শতাংশ। গত বছর পৃথিবীতে ১০ হাজার কোটি লিটার বোতল বন্দী জল বিক্রি হয়েছে এবং এই ব্যবসার সিংহভাগই নিয়ন্ত্রণ করে কয়েকটি গ্লোবাল কর্পোরেশন — ফরাসী কোম্পানী সুয়েজ ও ভিভেন্দি, মার্কিন কোম্পানী বেকটেল। ব্রিটিশ কোম্পানী টেমস ওয়াটার ও অ্যাংলিয়ন ওয়াটার সার্ভিসেস। ভারতে জলের ব্যবসা বাড়ছে বছরে ৫৫ শতাংশ হারে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের দেশে জলের ব্যবসা ১ হাজার কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

কিন্তু আমাদের কথা হল যে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জলাভাব যত তীব্র হচ্ছে, সরকারী বিনিয়োগ তত হ্রাস পাচ্ছে। বিশিষ্ট পরিবেশবিদ্ সুধীরচন্দ্র শর্মার হিসাব অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পানীয় জলের জন্য আর্থিক বরাদ্দ ১৯৯৭ সাল থেকে ২000 সালের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপাদনের ০.৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ০.২ শতাংশ। ইওরোপে প্রতি বছর যত টাকার আইসক্রীম তৈরি হয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সেটুকু অর্থও পানীয় জলের ব্যবস্থার উন্নয়নে খরচ করে না। এই সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছে যে, জল সঙ্কট সমাধানের একমাত্র পথ জলের বেসরকারীকরণ। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারও সেই নির্দেশ শিরোধার্য করে "জাতীয় জল নীতি ২00২" প্রণয়ন করেছে। এই নীতিতে বলা হয়েছে, "জল এখন কর্পোরেট সম্পত্তি। যে কোন পৌরসভা, আঞ্চলিক প্রশাসন পানীয় জল বন্টন নিয়ে বেদিশী কোম্পানীগুলির সঙ্গে কাজ করতে চাইলে সরকারী দায় মেনেই তাদের কাজ করতে হবে।" কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনে জলসম্পদের উপদেষ্টা সদস্য বিজেপি-র এ শেখর খোলাখুলি মন্তব্য করেছেন যে, "কল খুললেই জল পড়বে আর পয়সা খরচ না করে তা পান করবে, সেদিন চলে গিয়েছে।" এই নীতি রূপায়ণে বিভিন্ন রাজ্য সরকার পাল্লা দিয়ে নেমে পড়েছে। তামিলনাড়ু রাজ্যের দক্ষিণের দেশগুলো ভয়াবহ খরার কবলে, জলের তল নেমে গেছে এক হাজার ফুট তখন সেই অঞ্চলের মানুষের জলের প্রধান উৎস "ভবানী নদীকে" বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে কোয়েম্বাটুরে অবস্থিত অন্নপূর্ণা হোটেলের অধীনস্থ সংস্থা পুনম বেভারেজেসের কাছে। পুনম বেভারেজেস কোকাকোলার "কিনলে" কে বছরে এক

লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করবে আর তার বিনিময়ে তামিলনাড়ুর সরকারকে দেবে প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ টাকা। ছত্তিশগড়ের দুর্গ শহরের কোল ঘেঁষে বয়ে চলা "মেওনাথ নদী" কে ১৯৯৮ সালে মধ্যপ্রদেশ সরকার বাইশ বছরের লিজে স্থানীয় ব্যবসায়ী কৈলাশ সোনির সংস্থা রেডিয়াস ওয়াটার কোম্পানীর হাতে তুলে দিয়েছিল। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বামপন্থী দলগুলির ধারাবাহিক প্রতিবাদের ফলে ছত্তিসগড়ের বর্তমান সরকার এই বছর এপ্রিল মাসে সেই চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। এই ধরনের আরও ১৯টি একলা চলছে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে।

অথচ পৃথিবীতে অন্য দেশে জলসম্পদ বেসরকারীকরণের পরিণাম শুভ হয়নি। ব্রিটেনে ১৯৮৯ সালে জল ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ ঘটে। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ এর মধ্যে জলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৬ শতাংশ এবং বেসরকারী কোম্পানীগুলির মুনাফা বৃদ্ধির হার ৬২৯ শতাংশ। প্যারিসে জল বেসরকারীকরণের ফলে ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে জলের মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩০০ শতাংশ।

লাতিন আমেরিকার গরীব দেশ বলিভিয়া বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য শর্ত মেনে ১৯৯৬ সালে কোচাবাম্বা প্রদেশের জল সরবরাহের দায়িত্বসহ এদেশের সমস্ত জলসম্পদ মার্কিনী বহুজাতিক সংস্থা বেকটেলের অধীনস্ত সংস্থা অ্যাগুয়াসের হাতে ৪০ বছরের লীজে তুলে দেয়। ১৯৯৯ সালে ডিসেম্বর মাসে জলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে ৩০ থেকে ৩০০ শতাংশ। শুধু তাই নয়, খাল বিল পুকুরে জমা বৃষ্টির জল পর্যন্ত কিনতে বাধ্য হয় এই এদেশের অধিবাসীরা। পানীয় জলের এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ সর্বাত্মক চেহারা নেয়। প্রবল গণ বিক্ষোভের মুখে ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে বলিভিয়ার সরকার বেকটেলের সাথে চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়।

আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে জলের দামে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ ঘটেছে। ৫০০০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী বালকো বিক্রি হয়েছে ৫৫০ কোটি টাকায়, ২৫০ কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী জেসপ কোম্পানী বিক্রি হয়েছে ১৮ কোটি টাকায়। তাই আগামী দিনে জলের দরে আমাদের দেশের জলসম্পদের বেসরকারীকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা প্রতিহত হবে কি না সেটির উপরই নির্ভর করবে আগামী দিনে এই দেশের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের প্রশ্নটি।

অংশুতোষ খাঁ
অধ্যাপক, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ
(ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ক্রীড়া বিভাগ)

স্বপ্ন দেখি

—রাইকমল দাশগুপ্ত

ছোট্টবেলায় স্বপ্ন ছিল তেপান্তরের মাঠ
টপকে যাব পক্ষীরাজে, খুলব সে কপাট—
ছুঁইয়ে কাঠি ভাঙিয়ে দেব রাজকন্যার ঘুম
স্পর্শে আমার প্রাণটি পাবে প্রাসাদটি নিঝুম—

(হায়) সোনার কাঠি কোথায় আছে জানত না ত' কেউ
(তাই) উথলে উঠেও আছড়ে পড়ে ভাঙলো বুকেই ঢেউ
এখন বাড়ছে বয়েস, বাড়ছে তবু স্বপ্ন দেখি আয়—
বাড়ছে বয়েস বাড়ছে এখন পাল্টে সবই যায়।

মধ্যবেলার স্বপ্নে দেখি আসবে মাহুত ভাই—
বলবে, "ওঠো হাতির পিঠে, তোমায় রাজা চাই।"
দুলবে চামর, ঝুলবে মালা, সোনার পাখিটি
গাইবে মধুর বন্দনা। হায়, কোথায় সে বিধি—

ডাক তো এসে পৌঁছলো না, রইল নদীর পার,
সেই রাজ্যের খোঁজটি নিতেই হ'ল বয়েস পার।

বাড়ছে বয়েস, বাড়ছে বয়েস, স্বপ্ন দেখি আয়
বাড়ছে বয়েস বাড়ছে তবু খেলতে নামি আয়

থমথম সেই পাতালপুরী কেউ তো কোথাও নেই
করছে বুড়ি কাঁথা সেলাই সেই পাতালেতেই।
বৃদ্ধ এখন, স্বপ্নে ভাবি, হয়ত আদর করেই
ওই কাঁথাটি বিছিয়ে দেবে আমার কবর 'পরে।

এখন বাড়ছে বয়েস, চোখের জলে স্বপ্ন ভেসে যায়
বাড়ছে বয়েস, হায়, তবু তো স্বপ্ন দেখি আয়।
বাড়ছে বয়েস, বাড়ছে, এখন পাল্টে সবই যায়,

বাড়ছে বয়েস, খেলবি যদি, স্বপ্নদেখি আয়।

ড্রপ-আউট

—অরুন্ধতী চানক

পাঁচ কেলাসে না উঠতেই ছাড়িয়ে দিলে বাপ
কাজ নেই অত লেখাপড়ায়
মগডালে দিয়ে লাফ।
'চাষার পো! চাষের কাজে মনটি লাগাও কষে
বুড়ো বাপের গতর চলে না
হাঁড়ি চড়বে কিসে?
দাদারা সব ভেন্ন হয়েছে আলাদা আলাদা ঘর
তবু গাছের আমের ভাগ নেওয়া চাই—
বলে—'আমরা কি আর পর?'
কচি হাতের লাঙল দেখে মায়ের চোখে জল,
তবু তার যা পছন্দ, রাঁধে মা সেই ঝোল

এমনিতে কোনো অসুবিধা নেই
খাটতে পারে বেশ।
দুপুর বেলায় খাবার গেলে, গাছে দিয়ে ঠেস।
ভরদুপুরে শুধু যখন ধুধু করে মাঠ
খুঁটের বাঁধন আলগা করে বের হয় বইয়ের পাত।
আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরে মেটে না তার আশ,
চোখ ছাপানো জলের ধারা
ভেজায় আলের ঘাস।

শুধু ভাঙনের শব্দ নয়

—অমলকান্ত চক্রবর্তী

আরো কিছু শব্দ আছে নিবিড়ে বুকের নদী হয়ে, এইখানে
ডানার পিপাসা ঝরে পড়ে, ফোটে ফুল স্রোত ভালবেসে

এখন রক্তের মধ্যে রক্ত থেকে দু ইঞ্চি বিস্ময়ে
বসে থাকে দারোয়ান, দাঁত, নখ, যুদ্ধ, দাঙ্গা ধ্বংসের বিকাশে
ধ্বংসেরো বিকাশ হয় এই দেশে, ধ্বংসেরো বিকাশ হয়ে
দু' ফালি পেটের মধ্যে মৃত শিশু পচে ওঠে ভয়ে
আকাশে আকাশে ওড়া গুঁড়ো হাড় মেখে চাঁদ হাসে

তুমি কি আমার মধ্যে মাটি খোঁজো প্রাণের উল্লাসে? খুঁজি আমি?
আমাদের রক্তে মাংসে মিশে গেছে আমাদের পণ্য বিনিময়
নীল মাটি নীল জলে তবু আমাদের প্রেস, পরিচয়, বাঁচা

বাঁচি বলে ঘিরে নিই তোমাকে আমাকে জন্মদিনে,
দুপাশে খাদের মধ্যে জমা থাকে সাজানো ব্যর্থতা
দুটি একটি চারা বুনি, মরে যায়, ফের বুনি চারা
জীবিতের ইশারায় কোটি কোটি শব্দের রণনে
এই দেশ গান হয়ে ঘুমোয় ঘুমের মধ্যে তারা
মানবিক হয়ে ওঠে চিরায়ত ক্রুশিফিকশনে

শুধু ভাঙনের শব্দ নয়, শুধু পতনের শব্দ নয়
উত্থানের মৌল ক্রিয়া মেধায় আবেগে সহজাত
সেইখানে স্থির কিন্তু ঘূর্ণ্যমান অগ্নিবিন্দু কখনো নেভে না
মানুষের স্পর্ধা তাই মানুষের রাস্তা তৈরি করে
এক থেকে বহু হয় বহু থেকে ঢেউ হয়ে যায়
সেই ঢেউ পাঠশালা হয়ে ওঠে ঝড়ের বাগানে
রঙিন মার্বেলে মোড়া আমাদের সেই ছোটোবেলা
হন্যে কুকুরের মতো পালাতে পালাতে দিশাহারা
হারানো ঘুড়ির পিছে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত অভিঘাতে
তবুও ভেতর থেকে কোনোখানে পালাতে পারি না
ফিরে আসি সেই স্থির অভীক আবহমান ধ্যানে
ভাঙনের পাশাপাশি অবিরাম বিরুদ্ধ নির্মাণে

আবিষ্কারের ছড়া

ডঃ দিলীপ কুমার সেন
গণিত বিভাগ
আশুতোষ কলেজ

আছে উদ্ভিদেরও দুঃখের বেশ বোধ
জগৎকে কে দিলেন খবরটি এই খোশ?
—জগদীশ বোস।
ঘড়ির ধারণা এনে জীবনেতে গতিও
কে পেলেন বাহবা—যুগযুগ জিও?
—গ্যালিলিও গ্যালিলিও।
ভাবনার জলাধারে ডুবে জ্ঞানাধীশ
কে দিলেন ভাসমানবস্তুর তত্ত্বহদিশ?
—বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস।
মানুষ বংশধর বাঁদরের
কার তত্ত্ব এই বিবর্তনের?
—চার্লস ডারউইনের।
সাদার কাছে সদাই ঋণী, রামধনুর সাতরঙ
কে আমাদের দিলেন জ্ঞানের এই অমূল্যরতন?
—আইজ্যাক নিউটন।
আকাশে কীযে ঝলকায় ঘন মেঘে লীন
কে বললেন ওর মাঝে তড়িৎ আসীন?
—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীন।
সময় আপেক্ষিক, ট্যাঁক ঘড়িই আইন
আমাদের কে দিল এই ফরমাইন?
—নোবেল জয়ী আলবার্ট আইনস্টাইন।
থাকবে না যন্ত্রণা ঝরবে না রক্ত
সুষ্ঠ চিকিৎসার কে করতেন ধ্যান?
—ঋষি হ্যানিমান।
কেট্‌লির ঢাকনাটা নড়ে উঠে বাষ্প ছোঁয়ায় চটপট
শক্তিটা তো বেশ অদ্ভুত, ভেবে কে বলল "হোয়াট"?
—জেমস ওয়াট।
কলহ করছে যখন দুজন চরম
ক্যাটাসট্রফি তত্ত্বের কে দিলেন জনম?
—গণিত বিদ রেনেটম।
স্বপ্নের মধ্যে পেলেন এক নতুনদিকে
স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ধারণাটি কে?
—রেণে ডেকার্তে

ব্ল্যাক হোল্ বস্তু হিসেবে সতত রেডিয়েটিং
কে দিলেন এই আপাত বিরোধী জোকিং?
—স্টিফেন হকিং।
খাদ্যাভাবে নয়, অসম বণ্টনেই হয় দুর্ভিক্ষ যত
জগৎকে কে দিলেন এই নূতন কল্যাণময় তত্ত্ব?
নোবেল জয়ী সেন, অমর্ত্য।
"বল" হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ হল মাধ্যাকর্ষণ
মহাবিশ্বে কে করলেন বিশেষ এই জ্ঞান আহরণ?
—নিউটন নিউটন
পৃথিবীর যে ইতিহাস, তা দীর্ঘ এক শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস
সামাজিক রূপান্তরের ব্যাখ্যায় কে করলেন এই বিতর্কিত প্রয়াস?
—দার্শনিক কার্ল মার্কস
ইলেকট্রনের অবস্থান ও ভরবেগ যুগপৎ নির্দিষ্টভাবে করা যাবে না বার
এই আন্‌সারটেনটি নীতির জন্ম দিয়ে কে হলেন পরমপ্রিয় সবাকার?
—নোবেলজয়ী হাইজেনবার্গ, ওয়াবনার।
তিন ধরনের "বল"-এর বেশি নয় সমাহার, এই বিশ্ব আলাম
এই তত্ত্ব আবিষ্কারে কে পেলেন জনগণের অকুণ্ঠ সালাম?
—নোবেলজয়ী আবদুস সালাম।
খবরাখবরের অদ্ভুত মাধ্যম পাওয়া গেল কম্পুটারে
এই ই-মেল ব্যবস্থা কে এলেন নিয়ে সবার তরে?
—টমিলসন, রে।
রেডিয়াম, পোলোনিয়াম মৌলিক উপাদান দুটি ভীষণভাবে তেজস্করী
অমানুষিক পরিশ্রমে এই দুটি আবিষ্কার করে কে হলেন শেষে জ্ঞান বুড়ী?
—দুবার নোবেলজয়ী মেরী কুরি।
অদৃশ্য আলো, যাকে এক্সরে বোঝেন
সাধনায় কে তাকে প্রথম যোজেন?
—নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রণ্টজেন।
সুদুর প্রসারী ফল লাভে চাই ধনবিজ্ঞানকে ঠিক অ্যাবস্ট্রাক্ট চোখে দেখার
"হিস্ট্রি অফ ইকনমিক অ্যানালিসিস" লিখে কে করলেন তাই মনজয় সবাকার?
—জার্মান মহাপণ্ডিত যোসেফ এ শুম্পেটার।
মানুষের রোগ দেবতা বা পুরোহিতের নয় কোন অভিশপ্ত আদেশ
এই চিন্তাধারা এনে কে দিলেন আমাদের এক সাহসিক সন্দেশ?
—ভেষজ বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রাতেস।
পরস্পর নির্ভর শীল বাস্তব জীবনের খেলাতে পুরোপুরি সচেতন হলে সকলেই
পেতে পারে লাভের আশ্বাস
এই বিখ্যাত খেলা-সাম্যতত্ত্বের দ্বারা কে খুললেন সামাজিক লাভ ক্ষতি
রহস্যের জটিল সেই ফাঁস?
—নোবেলজয়ী গণিত বিদ জন ফরবেস নাশ।

তিন সত্যি—এক মিথ্যে

অনুজ গাঙ্গুলী

আমি ফুল ভালোবাসি না।
ফুলকে বাজারে পসরা হ'তে দেখি
কোন স্তাবকের হাত হ'য়ে
যায় কুখ্যাতদের কাছে—
ছিনিয়ে নেয় গরীবের সুন্দরী মেয়েকে,
আরও আরও অনেক কিছু;
ফুলকে ভালোবাসলে
আমার মনটা
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধ্বংস হোত।

আমি গানও ভালোবাসি—না।
গানের নামে বেসুরো চিৎকার—
বাজনার অপ্রয়োজনীয় ঝংকার—
সীমাহীন মাইকের তাণ্ডব
চলতে থাকে হাসপাতালের পাশে,
হার্ট কিংবা নার্ভের রোগীর কানের কাছে;
গানকে ভালোবাসলে
আমার অনুভূতির
স্থান হ'তো বৈদ্যুতিক চুল্লীতে।

আমি শিশুদেরও ভালোবাসি না।
নবজাতককে যখন পাওয়া যায়
জঞ্জালের আস্তাকুঁড়ে,
পার্কের ধারে কিংবা হাসপাতালে,
বাবা-মায়ের হিসাব মেলে না কোথাও—
হয়তঃ'অডিটোরিয়ামে' অনুষ্ঠানে মত্ত,
ধারা বা রেস্তোরাঁয় বিনোদনে ব্যস্ত;
শিশুকে ভালোবাসলে
আমার হৃদয়টা
দুমড়ে মুচড়ে পাথর হ'য়ে যেত।

প্রাণহীন জীবনের ধকল প্রাণান্তকর।

শিল্পী আমি

ছবিটা আঁকা তখনও,
বোধহয় শেষ হয়নি।
গোধূলির সিঁদুর মেঘে
রাঙিয়ে তোলা হয়নি আকাশটাকে;
হঠাৎ এক তীব্র যন্ত্রণায়—,
কেঁপে ওঠে হাতটা...
চেনা ছবিটা এক নিমেষে
অচেনা হয়ে পড়ে
তুলির বৃন্ত থেকে—,
রক্ত ঝরে...!
রঙটা কিন্তু তখনও লাল
শুধু এ লালিমার উৎসটা ভিন্ন!
এতো নয় কোন স্বপ্নের রঙীন বোধন
এ আমার ক্যান্‌ভাসের শোণিত ক্ষরণ
তার ক্ষতবিক্ষত বুকে আঁকা ছবিটার সাথে
আজ তার সহমরণ।
থাক, সে আজ বহুদিনের কথা,
না-না—হয়তো বা চিরদিনের কথা
এইভাবে হারায় কতো ছবি
সাদা-কালো, মন্দ-ভালো সবই;
তবুও যে ছবি আঁকি, আঁকতে আমায় হবেই
এ দায় যদি পূরণ করি, মুক্তি আমার তবেই।

আমার শিরায় শিরায় বয়ে যাওয়া লোহিত ধারা
ভেবেছিলাম সেই স্রোতে ভেসে বুঝি
বহুদূর চলে গেছে তারা;
আর কখনো আসবে না ফিরে
তবু কখন কে জানে—,
চেতনার নির্জন ক্ষণে
কি অবচেতনার গভীর গহনে
উঁকি দিয়ে যায় তুলির টানে।
সে রঙে রঙ মিলিয়ে
আবার হই বিপথগামী—,
কেন জানো?
শিল্পী আমি...!

—স্বাগতা নন্দী
বিএ (প্রথম বর্ষ)
ইংরেজি (অনার্স)

মা

মা মানেই কোমল পরশ
স্নেহের আশিস্ ভরা,
মা মানেই মধুর মুখে
মধুর হাসি ঝরা।
মা মানেই আঁধার মাঝে
এক চিলতে আলো,
মা মানেই এই জগতের
সব চাইতে ভালো।
মা মানেই ঢাকাই শাড়ি
কপালে লাল টিপ,
আলতা রাঙা পা দু'খানি
রাঙায় সকল দিক।
মা মানেই তপ্ত দেহে
শীতল হাতের ছোঁয়া,
সব খাবারের চাইতে মধুর
মায়ের হাতের মোয়া।
মা মানেই সন্ধ্যা প্রদীপ
তুলসী তলায় জ্বালা,
মা মানেই শাঁখের আওয়াজ
ধূপের গন্ধ ঢালা।
মা মানেই রাতের বেলায়
ঘুমপাড়ানি গান,
মা মানেই ভোরের বেলায়
ভৈরবীর ওই তান।
মা মানেই স্নেহের বাঁধন
নিশ্চিত আশ্রয়,
মা মানেই কড়া শাসন
মনের কোণে ভয়।
মা মানেই নীল আকাশে
মেঘের লুটোপুটি,
মা মানে একেবারে
অন্য অনুভূতি।

—অদ্রিজা দত্ত
বিএ (প্রথম বর্ষ)
ইংরেজি (অনার্স)

জন্মদিন

স্বপ্ননীল, আজ তোমার জন্মদিন,
সব নিয়মের বেড়াজাল টপকে,
কবরীতে বেঁধেছি জুঁই, পরনে কামরাঙা শাড়ী।
পঁচিশটি জ্বলন্ত মোমবাতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে;
প্রতিটি শিখাতেই তোমার কম্পমান প্রতিচ্ছবি।
রজনীগন্ধার আঘ্রাণ আর স্মৃতির লহরী
আলতোভাবে স্পর্শ করছে মনকে।

জানো, তুমি যেদিন যোগ দিলে সেনাবাহিনীতে,
তোমার মা এক অজানা আশঙ্কায়
আঁচলে মুখ চেপে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন।
আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম,
রত্নগর্ভাদের কাঁদতে নেই!
তারপর অন্যদের জন্মদিনের নিরাপত্তা দিতে
কখনো উষর ভূমিতে বা কাশ্মীর লাদাখের সীমান্তে।
শতমাইল দূরের অনতিক্রম্য নিঃসঙ্গতা
সঙ্গ দিতে তোমার প্রিয়জনদেরও।

গতবছর জন্মদিনে বাড়ি আসবে বলে কথা দিয়েছিলে;
'উপরওয়ালাদের' দাক্ষিণ্যে অবশ্য সে ছুটি মেলেনি।
তবুও তোমারই অজান্তে অতৃপ্ত বাসনাকে তৃপ্ত করতে
পুষ্পে-গন্ধে বাড়ি হয়ে উঠেছিল উৎসবমুখর।
সন্তানের মঙ্গল আর দীর্ঘায়ু কামনায়
বারংবার ধ্বনিত হচ্ছিল শঙ্খধ্বনি।

মন উদাস করা সায়াহ্নের আকাশ,
তোমার অবয়ব প্রতিবিম্বিত হল পশ্চিম দিগন্তে, সন্ধ্যাপ্রদীপে।
হঠাৎ একটি গাড়ি প্রায় নিঃশব্দে এসে থামল,
তারপরে আরো দুটি, বাড়ির সম্মুখে।
কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেনাদের আনাগোনা,
এরপরে কয়েকজন সেনা ধীরে ধীরে নামিয়ে আনল
একটি অস্পষ্ট, কালো..........
কফিন..........

না! না! আমি কিছুতেই মনে করতে চাই না—
সেই অর্ধদগ্ধ, ছিন্নভিন্ন, ক্ষতবিক্ষত,
দলাপাকানো শরীরটাকে।
হঠাৎ দমকা বাতাসে নিভে গেল সব—
বেজে উঠল বিউগলের ধ্বনি।
পাশের বাড়ির ছোট্ট পাপাই অবোধভাবে শুধাল,
'যুদ্ধ কেন হয়?'

এবছর পাড়ার বিদগ্ধজনেরা
মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছেন,
বলছেন, তুমি মৃত্যুবরণ করে শহীদ হয়েছো।
কিন্তু আমার কাছে আজ তোমার 'জন্মদিন',
পুনর্জন্ম হয়েছে।

সুব্রত ঘোষ, তৃতীয় বর্ষ,
সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যা।

নাগরিক

ছেচল্লিশের সেই শেষ বিকেলটায়—
অবসন্ন রোদ্দুর যখন
আমার কয়েক পুরুষের ভিটেকে
শেষবারের মত চুম্বন করেছিল,
তখন আমার নাড়ীর কাছে
একটা দগ্‌দগে ঘা।

তারপর,
আমার নতুন দেশ হয়েছে,
হয়েছে নতুন পরিচয়—'উদ্বাস্তু'।
মাটির গন্ধ নিতে গিয়ে
আমি কংক্রিটে ধাক্কা খেয়েছি।
গাছের গুঁড়িতে মাথা রাখতে গিয়ে
মাথা ঠুকেছে ল্যাম্পপোষ্টে।

আমার পেটে খিদে,
শরীরে ক্ষতচিহ্ন,
মনে ঘুনপোকার বাসা,
নাড়ীতে ঘা,
আজ আমি নাগরিক।

শ্রীজিৎ দাশ
মাইক্রোবায়োলজি (অনার্স)
প্রথম বর্ষ

সহজপাঠ

ইতিহাসের বর্ম থেকে
আমি আলো পাচ্ছি 'ভ্যান গঘ্'-এর।
সানফ্লাওয়ার আর চারকোলের টুকরোয় আঁকা
রাতের শহরে
শেকস্‌পিয়ারের বঙ্গানুবাদ প'ড়ে আমার মনে হয়েছে
'রাত' নয়,
এ আসলে
মেঘের আকাশ

লক্ষ্মী-সরস্বতী খেলা করছে আমাদের কাঁচা মন্দির উঠোনে
মোমবাতি জ্বলছে না।
কষ্টে জোগাড় কড়াইশুঁটি প্রসাদ হয়ে গেছে কখন
বৃষ্টি এলো
ঝপাংঝপ ঝাঁপ ফেলছে দোকানকাকুরা।

স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রথম কবিতা লিখে
ঘুড়ি লুটছে
দীপ, ভাণ্ডারী, দিগন্তরা

প্রতিবার অঙ্ক এক্‌জামে মা'র কথা মনে পড়ে যেত
বাবা প্রশ্ন দেখেই ব'লতো
'পেরেছো তো?....'
'হ্যাঁ' বা 'না' মাথায় আসত না কিছুতেই,
ভয়ে ভয়ে
ঘরে ফিরেই
চলে আসতাম বারান্দায়। পুজোর পর 'গার্জেনকল্‌', জানি!
এবার রেজাল্ট হলুদ না নীল, জানি না।
ওই তো ঠাকুমা। 'শ্রীকান্ত'র মলাট ছিঁড়ে গেছে

সিংহবেশে আকাশ নেমে আসছে পাড়ার মাথায়,
পোস্টের ওপর এখনও ঘুড়ি বাঁধা
ঘর আমার প্রথম পড়া বই
ভাইবোনেরাই প্রথম পুতুল খেলা

টালির চালের ফ্রেমে ভাঙা চাঁদ
জানলা থেকেই প্রথম বাঙলা শেখা

ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়
বিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

দু'টি কবিতা

(১)
প্রচ্ছন্ন প্রণয়

গৌষপার্বণে পার্বতীকে দেখে, প্রথমে
পথশ্রান্ত পান্থ পড়ে তার প্রেমে
পূর্ণবয়স্কা পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে
প্রভাতে প্রদীপ্ত প্রদীপ নিভিয়ে
প্রবাসে পরিচয় পরিবর্তন করে দাঁড়ায় প্রেমের প্রার্থনায়।
পৌষের পরিত্যক্ত পাতা পৃথিবীর পরে
প্রেম পরিণয়ে পরিণত হবে পাতাল ঘরে
পড়শি প্রেমের পরশ পরলোকে
প্রার্থী-প্রাপক পত্র পায় প্রান্তিকে
প্রসারিত পা পুষ্পিতা পুষ্প-বাগান ছেড়ে প্রশান্ত পদ্মায়...

(২)
নিরন্তর নিরাশা

নিবিড় নিশীথে নীল নদীর ঢেউ
নিদ্রিত নরগণ দেখেনি কেউ
সুসজ্জিত সিঁদুরে আলো শেষ হতে থাকে
সাম্পান মাঝি একা, সলিলের ফাঁকে
নগরের নয়নজুলিতে নীলাভ নক্ষত্র নীরবে নত হয়।
নিশীথে নির্লিপ্ত নাড়ার ফকির
নরলোকে নিপীড়ন তবু নিরুত্তর
নিরন্তর নদী-নারী নগ্ন নির্জনে
নওজোয়ান আসে না দুঃখ নিরসনে
নদী জানে নাবিকের দেখা হবে নওরাতির নির্জনতায়...

দেবব্রত মণ্ডল
বাংলা অনার্স (প্রথম বর্ষ)

তিতাস

সেদিনও তো এমনি বাদল ঝরে ছিল আনমনে,
সেদিনও তো এমনি মাদল বেজেছিল মোর কানে,
সেদিনও তো মোর সজল চক্ষু ছিল আকাশপানে,
সেদিনও তো তুই বললি কতো কথা মোর সনে
ভেবেছিলাম রাখব তোরে, বাধব তোরে, ভালবাসার জেরে
ভেবেছিলাম এগিয়ে যাব তোর 'বাবা' ডাকটা ধরে।
ভেবেছিলাম বাঁচব মোরা পাঁচ পঁচিশে মিলে,
এমনি ভাবেই এগিয়ে যাব নতুন উষার কোলে,
বাপ বেটিতেই কাটিয়ে দিতাম জীবন জীবন খেলা,
'মা'-টা মোলো সাপের বিষে বাকী রইল বেলা।
সেদিন তুই সাত মাসের, ছিলি সদ্য ফোঁটা কুঁড়ি,
সেদিন থেকে তোর বাপ-মা হলাম একা কানুজুরি।
শপথ নিলাম করব মানুষ, তোর মায়ের স্বপ্ন নিয়ে।
ফেরালাম তার হিতৈষীদের স্বাদীতে অমত দিয়ে।
ধীরে ধীরে তুই হাটতে শিখলি, বলতে শিখলি কথা।
'তিতাস' তোর নামটি দিলাম যা প্রাণে ছিল গাথা,
আজও ঠিক তেমনি আছিস, যেমন ছিলিস পাঁচে,
আমি শুধু বুড়িয়ে গেলাম পঁচিশ থেকে বাটে।
আজও তোকে দেখতে পাই সাঁঝের বাতি জ্বেলে,
আজও তোকে শুনতে পাই অন্য মায়ের কোলে,
আজও তুই একই রকম ছানি পড়া চোখে,
আজও তুই মনে করাস চুমা দিতে তোকে।
এতই যদি বাসিস ভালো, কেন গেলি ওপার
মাকেই তুই আপন করলি বাপকে করলি পর।

শীর্ষেন্দু সেনগুপ্ত
প্রথম বর্ষ (বি এস সি)

শ্রাবণের গন্ধ আজ....

শ্রাবণের গন্ধ আজও
মিশে আছে আমার হৃদয়ে।
বাঁশবনে হুল্লোড় নেই, তবু—
ঝিরিঝিরি বৃষ্টিভেজা দিনে
স্মৃতি-শব্দ-গন্ধ-রং মিলেমিশে
একাকার।

অদ্ভুত আবেশ চারদিকে।
ভোররাতে শীতঘুম দেয় ব্যাঙ।
কালো মেঘ
বিলীন হয়ে আকাশের বুকে খোঁজে
অস্তিত্বের ঠিকানা।

এরই মাঝে—
এসবেরই মাঝে—
ধোঁওয়া ধোঁওয়া ঝাপসা, কোনও জলছবি
ভেসে আসে
হিমেল বাতাসে।

তুমি রোদ হয়েছিলে শ্রাবণের।
মেঘের চাদর থেকে উঁকি দিতে।
কেড়ে নিতে মন।
বাঁশবনে চুপিসারে—
রূপকথা ডানা মেলে পাড়ি দিতো
ভিনদেশ খুঁজে নিতে।
আজ সারাদিন কেটে গেলো মিছেই
নিরাশায়, ব্যর্থতায়—
পাতা ঝরা কান্নায় বুক ভরে।
তবু তুমি শ্রাবণেই থাকো
আরও নীল—ঘননীল পর্দায়
প্রতীক্ষায় জলছবি হয়ে।।

প্রীতম ভট্টাচার্য
অর্থনীতি অনার্স (দ্বিতীয় বর্ষ)

স্বার্থবাহক

(১)
তোমার ইশারায় একদিন হেঁটেছি আমরা অনেক পথ
মরীচিকাকে জল ভেবে অথবা জলকে মরীচিকা
ভাবতে শিখে তোমার সাথে অনেক পথ হেঁটেছি
অনন্ত মাইল পথ শেষে রুটি পাব বলে জেনে শেষে তুমি
পাথর কে রুটি আর রুটিকে পাথর
ভাবতে শিখিয়েছ।
যতদূর চোখ যায় তোমার অতিক্রান্ত পথ যতদূর চোখে পড়ে,
পৃথিবীর উপরে সূর্যের অর্ধেক ছায়াটুকু দেখে
বাঁচতে শিখেছি ঘরেরই ভিতরে।

তোমার ঔরসে আমাদের জন্ম বলেই (কি?)
তোমাকে পিতা বলে জানার করেছি শপথ
যদি আন্তরিক ভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো—
আমাদের গতি ঢের দিন আগেই হয়ে গেছে
শ্লথ।

(দেখেছি মননের দৃষ্টি মেলে
আমাদের ইতিহাস চেতনায় ভর করে বহুদূর ডানা মেলে
জটায়ুর মতন দেখেছি)
তোমার পদক্ষেপে লালসা ফুটে ওঠে পৃথিবীর হৃদয়ে,
কুষ্ঠরোগীর শরীরের মতো অনুভূতিহীন হয়ে যায়
সেই সবস্থান।
নারীর জঙ্ঘায় সারো তোমার প্রাতঃরাশ,
পৃথিবীর ছায়া বিকেলের সূর্যে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়....
.... এমনি করেই হয় আরেকটি দিনের অবসান।

তুমি সব জানো, জেনে তাই বন্ধ করেছ হৃদয়ের
স্বাভাবিক কল্লোল;—
যে শিশু দুধ খেয়ে হয়েছিল বড়,
তার কাছে তাই স্বাভাবিক, অকৃত্রিম মনে হয় আজ ঘোল।

(২)
এইখানে এখন স্বপ্ন সত্যি রামধনু হয়ে উঠুক
আমার আকাশে,
মানুষকে বাঁচতে দাও মানুষের আপনার বিশ্বাসে
আবার তোমার জতুগৃহে আগুন লাগুক,
নিষাদ নয়,—জ্বলে পুড়ে মরুক এবার—পাণ্ডব,
অগ্নিকে বাঁচাতে গিয়ে কেন দাহ হতে হবে তোমায়
—খাণ্ডব?

মানুষের জন্ম, জীবন, প্রেম, মৃত্যুকে বিপ্লবের থেকেও
ঢের মনে করো প্রাচীন?
ইতিহাস নয়, প্রাগৈতিহাসিক নয়;
জীবন, প্রেম, মৃত্যু মানুষীর গর্ভের ভিতর
(সব) লীন হয়ে গেছে।

এই ভাবে ধাপে ধাপে নীচে নেমে গেলে তোমার মুছে যাবে
ক্রমে;
আহ্নিক, বার্ষিক গতি তবুও রয়েছে,
রয়েছিল, রবে সৃষ্টির নিজস্ব নিয়মে।।

দেবাঞ্জন মুখার্জী
বাংলা স্নাতক (প্রথম বর্ষ)

যখন আঁধার নামে

কত রঙ মুছে দেয় বিন্দু জলের কণা
কত মন ভেঙে দেয় ধুম্র মেঘের দানা;
কত রোদ ঝলমল একটু আগের কথা
নিরাশায় জেগে ওঠে উদাসী মনের ব্যথা;
যখন আঁধার নামে মেঘলা আকাশে—
শ্রাবণ সন্ধ্যায় কেবলই আলোছায়া
হৃদয় মনের মাঝে ইন্দ্রজালের মায়া;
বিস্মৃত দৃশ্যের — সমুদ্রে বিলীন
দুর্দান্ত অবলোকণ — এ মন মলিন।

কত হাওয়া বয়ে যায় সীমানার ওপারে,
কত পাখী উড়ে যায় বেড়াজাল ভেঙে;
বন্ধনে বাধা পড়া দু'চোখ ভাবে—
কল্পনা বাঁধে মোর দেখি কোন্ ভাবে;
যখন আঁধার নামে মেঘলা আকাশে—

কত চোখ রক্তের, কত হাত দণ্ডের
কত সাজ ডঙ্কার, কত ধুলো দর্পের;
এ মহাপ্রান্তরে কী মহা আয়োজন—
মূল্যবোধের খেলা — নিষ্পাপ দুনয়ন।

স্মৃতি ফেরে আকাশে, নীল সীমা প্রান্তর
স্বপ্নের গতিবিধি — ধূসর নিরন্তর;
পাহাড়ের শেষে দেখা আকাশের ক্রন্দন
ঠিকানা হারানো মন—স্থির হয় স্পন্দন;
যখন আঁধার নামে মেঘলা আকাশে—

দেবাশীষ ঘোষ
অর্থনীতি বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

হাওয়া

একঝলক হাওয়া এলোমেলো করেছিল স্তব্ধতাকে।
উড়িয়ে দিয়ে গেল পাণ্ডুলিপির পাতা। দিনান্তের গোধূলি
আলো মেখে আকণ্ঠ নীরবতা, স্তব্ধতা। যেন এক অনুপলে
দাঁড়িয়ে গেছে—সময়।
বিষণ্ণ আঁধার ধীরে ধীরে গ্রাস করবে নিরপেক্ষ
সময়ের স্তাবককে। তারই প্রতীক্ষায় গুম হয়ে অবক্ষয়ের
শব্দ শোনা।
হাওয়া—ক্ষনিকের ছোঁয়ায় তোমার, ক্ষুদ্র অস্তিত্ব
দোলে।
ঝড় উঠে তোলপাড় করে দেয় মনের শান্ত—
জলটুঙ্গিটায়।
হাওয়া—নীরব তুমি, মূক তোমার আশা—এসে
চলে যাওয়া।
তবু চরম নিস্তব্ধতায় শিহরণ জাগায় নৈশব্দ—
শিরায় শিরায়।
মনের মাঝে একলা বসে, একান্তে একান্তর পাশ
ঘেঁসে, তোমার বোঝা—হাওয়া!
হঠাৎ মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে, ভিতরটা
ভীষণ ভীষণ ফাঁকা।
নেই নেই হাহাকারে সেই নীরবতা।
বিরক্তির অবসন্নতা, পেয়ে না পাওয়ার ব্যথা,
চেয়ে না চাওয়ার ঔদ্ধত্য।

এক চিলতে হাওয়া—মাতাল করা হাওয়া—
হাওয়া তোমার হারিয়ে যাওয়া, পিছে তাকিয়ে
না চাওয়া।

শান্ত রিক্ততা, অশান্ত চাহিদা, একটু থমকে
দাঁড়াও তুমি হাওয়া।
তোমার না ভেবে করা, করেও না ভাবা, হাওয়া অদ্ভুত
তুমি।
কিন্তু হাওয়া—নিজেকে চেন, জান, তারপর
ধেয়ে এসো 'আমাদের' দিকে। □

শ্রীমন্তি মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বর্ষ, (সোসিওলজি)

আজব খবর

সকালবেলা উঠে দেখি
খবর কাগজের পাতাতে,
আজব খবর এক
দেখে চোখ ওঠে মাথাতে।
ছাগলের দাড়ি নাকি
আরশোলা কাটছে,
বাঁদরে এ যুগে নাকি
ইতিহাস লিখছে।
বাঘ নাকি স্কুলে গিয়ে
হুকোটানা শিখছে,
ব্যাঙ নাকি ঠ্যাঙ ভেঙে
ক্রাচ নিয়ে হাঁটছে।
মশা নাকি রোজ দিন
কোল্ড ড্রিংক্স খাচ্ছে,
তাই দেখে সিংহ মামা
মাংস খাওয়া ছাড়ছে।
হঠাৎ কিসের খোঁচায়
ঘুম ভেঙে গেল যেই,
তাই ভাবি এই সব
স্বপ্নই ছিল ভাই।।

সঙ্গীতা দাস
বি এ (দ্বিতীয় বর্ষ)

যদি আর কোনওদিন....

যদি আর কোনওদিন আকাশের নীল
রক্তের লালে মেশে
তোমার দুচোখে যৌথ খামার
অমারাত্রির শেষে,
ডেকে আনে যদি কৌমুদী
আর বর্ষাশেষের গান
ভারতবর্ষ আবার করবে
নব ধারাপাতে স্নান।

তোমার মুক্তি আমার প্রেরণা—
তোমার মাটিতে ফসল।
কে বুঝেছে বলো
তোমার মাটিতে
কে সুদ, কে-ই বা আসল?

ঋণ দিয়ে গেছে, ঋণ দিয়ে যায়,
ওরা ঋণেরই তো ব্যাপারী।
দিন দিয়ে দেখো রাত চলে যায়
স্বপ্নের চোরা কারবারি।

ভাঙা খিড়কিতে কোন্ তালা দিয়ে
আটকাবে বলো ওকে?
ওরা তো কাঁদেনি
পুড়ে যাওয়া সেই সন্ন্যাসিনীর শোকে।

ওরা তো দেখেনি খনিজের রং
মাটির গভীরে রস
রূপান্তরের গোধূলিকে ওরা
করে মৃত্যুর বশ।

ওরা তো দেখেনি সবরমতীর
চড়ে মৃত মুখগুলো।
ওরা তো দেখেনি অমরাবতীতে
রাত শেষে ভোর হ'ল।

তোমার চোখের চক্রবালের
দিগন্ত ছোঁওয়া হাসি
যদি পারো তবে একফলা দাও
ও চোখেও রেখে আসি।
সেই চোখে কোনও প্রেমিকার মুখ
যদি ওরা চিনে নেয়
সুদে ও আসলে মিটে যাবে জানি
ঘাতক-রাত্রি-ভয়।

শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত (অর্থনীতি বিভাগ)

নারী

নির্বাক জীবনের বাক্‌শক্তি তুমি এক নারী।।
এ নারী কি অতীব সাধারণ?
সে সকল সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ।
সে উদীয়মান সূর্য, সে সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প
সে রক্তিম, প্রতিবাদিনী, অন্যায়ের প্রতি সদাই রুষ্ট।
'নারী' ফুলের সৌরভ, বনের চঞ্চল হরিণী
'সে যে সুন্দর, পবিত্র হাস্যের অধিকারিণী'।
জীবন যুদ্ধের কোন আঘাতই পারেনি তাকে টলাতে,
তবুও... কি যেন নেই,
স্মৃতির আগুন আজও আসে তাকে জ্বালাতে।
সে 'নারী' আজ বিচ্ছিন্ন, 'শান্তির খোঁজে—
'শান্তিরই প্রেক্ষাপটে সে আবিষ্ট।
মুখের হাসির আড়ালেও না-জানি তার
লুকিয়ে আছে কত কষ্ট।
হৃদয় রাজ্যের শান্ত সম্রাট—
সে চেয়েছিল হাসির আড়ালে সকল কষ্টে
ধুলিসাৎ করতে,
কিন্তু সে 'নারী' সম্ভবের ক্যানভাসে
আজও এঁকে চলেছে অসম্ভবের চিত্র—
অঙ্কণে পটু সে 'নারী' দেয়নি তাকে তুলি ধরতে,
চায়নি বুঝতে, চায়নি জানতে।
সেই সম্রাট তবুও বদলে চলেছে তার ক্যানভাস,
চেয়েছে হৃদয়ের চিত্রটিকে উন্মুক্ত করতে,
পেরেও পারেনি সে—পারেনি কোন শর্তে।
জানেনা সে নারী, তারই হাতের রেখায়
রয়েছে কোথাও সে সম্রাটের নাম।
দেখবে যেদিন, পড়বে যেদিন; প্রেমই হবে জয়ী,
প্রেমই হবে দেবতা, থাকবে না আর কোন
ভগবান।

শান্তনু দত্তগুপ্ত (প্রাক্তন ছাত্র)

আমি পারিনি

[গুজরাটে দাঙ্গার সময় নিজের অসহায়
উপস্থিতি সেখানে কল্পনা করে লেখা]

দু'ফোঁটা চোখের জল চুঁইয়ে পড়েছে গাল বেয়ে
নিঃশব্দে, নীরবে, সকলের অগোচরে।
মনের কোণে অনুভব করেছি সুতীব্র বেদনা,
শোকে স্তব্ধ হয়েছি, প্রকাশ করতে পারিনি
ওরা মুসলমান বলে।

জলে ভেজা চোখে দেখেছি ওদের ধর্ষিত নগ্ন রূপ
রক্তে ভেজা নিস্পন্দ দেহ।
রাস্তার ধুলোয় দেখেছি ওদের কবরস্থান,
ওলোট-পালোট হাওয়ায় পেয়েছি ওদের পচা মাংসের গন্ধ,
নদীতে বয়ে যেতে দেখেছি ওদের রক্ত গঙ্গা।
চুপ করে শুধু দেখেছি, কিছু বলতে পারিনি।
হায়রে! আমি হিন্দু বলে।

মধ্যাহ্নের পোড়া রোদে শেষ হয়ে গেছে ওদের আশা।
তপ্ত ধূসর বালিতে মিশে গেছে ওদের সব আকাঙ্ক্ষা।
ঝোড়ো হাওয়াতে বিলীন হয়ে গেছে ওদের স্বপ্ন
অনুভব করেছি, প্রতিবাদ করতে পারিনি,
ওরা মানুষ বলে, হয়তো আমি সম্পূর্ণ মানুষ নই বলে।

বোধের অসহ্য আগুনে আমি পুড়ে গেছি।
ভাবনার পেষনে আমি পিষ্ট হয়েছি।
চেতনার স্ফুলিঙ্গ আমাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে।
হয়তো আমি কিছুটা মানুষ বলে, সামান্য মনুষ্যত্ব আছে বলে।

কিন্তু তবু পারিনি স্বপ্নের রামধনুর সাতরঙকে
রক্তে রাঙা হওয়া থেকে রুখতে।

অভিজিৎ দাস
বি এস সি (প্রথম বর্ষ)

সিদ্ধান্ত তোমার

হে নবজাতক আগমনী,
তুমি কি তৃতীয় বিশ্বের পদাতিক?
যদি হও তবে অনুসরণ করো
পূর্বপুরুষদের সগর্ব ঘোষণা—
আমার সন্তান যেন থাকে নত মস্তকে।
হে নবজাতক কুশীলব,
তুমি কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্পন্ন?
যদি হও তবে উপভোগ করো
পূর্বপুরুষদের অভিনয় দক্ষতা—
রঙ্গমঞ্চ কার্গিল থেকে গুজরাট।
হে নবজাতক ক্ষুধার্ত,
তুমি কি খাদ্যান্বেষণে প্রস্তুত?
যদি হও তবে পর্যবেক্ষণ করো
পূর্বপুরুষদের খাদ্যরসিকতার পন্থা—
নরমাংসের ব্যঞ্জনে DNA।
হে নবজাতক ইচ্ছুক,
যদি তোমার থাকে আমরণ সহনশক্তি
তবে স্বাগত
নতুবা; রাতটা শেষ হোক—
তোমাকে পাঠাবো রক্তিম আলোর
প্রথম বার্তা; সিদ্ধান্ত তোমার....

সৌরভ নন্দী
প্রাণিবিদ্যা (সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

তামসী

আলোর পরে বেরিয়েছি...
আলোর পথযাত্রী আমরা;
এবার তমসার পথে—
এই প্রথম।

হাসির কলতান অস্পষ্ট
অগোচরে স্বর্নালী ঐক্যতান,
নেই জলের মত সমতলপ্রাণ...
সুরেলা স্বর হয়েছে বিলীন—
নতুন আমি।

পথ চলতে হইনি শ্রান্ত
অমানিশার আলোয়—
আমাকে তো যেতেই হবে...
সত্যসন্ধানী পেডেস্ট্রিয়ান্।

দোদুল্যমান আকাশ, মেঘের ছাউনি—
সমাচ্ছন্ন অন্ধকারের মায়াজাল।
অপরূপ, গ্লানিহীন তামসী আকাশ
ঝিমকালোর মধ্যেও হয়েছে প্রকট....
যেন বাতিঘর।

নিরাভরন স্রোত অবিরাম প্রবাহিত—
নিশ্চুপতার মোহাবেশে—
তামসী তার কাণ্ডারী...
নব আহ্বানের দিশারী।
এগিয়ে চলি।

এ রাতের নেই কোন অবসাদ—
এ মুহূর্তে সঙ্কীর্ণতা বন্ধনহীন,
হতাশার আনন্দ হয় মহীরুহ।
ব্যর্থতার প্রলয়োল্লাসে—ভারাক্রান্ত
রজনী চলতি হৃদয়ে দেখে—
আমার চোখ।

একসময় নির্জন নিশুতি নিশীথ
বহে নিয়ে আসে কোলাহল,
বদলে যায় স্ফটিক রাতের প্রকৃতি।
ফিরে আসে মায়াবী রাত
পলকহীন চোখে—
একচুল দূরে প্রবেশের অধিকার বিলুপ্ত,
আমার স্বপ্নছবি'র।

হাসির হোমাগ্নি হার মানে
কান্নার কলিংবেলের কাছে।
নিমেষেই, কলঙ্কিত রাত্রির রুদ্ধ সাইরেন—
প্রত্যক্ষ জানায়—নির্জলা নীলাম্বরকে।
শুরু হয় অমানিশার অসামান্যতা—
কলতান।

কালঘুমে বিনিদ্র প্রকৃতি
নির্বাক হয়ে দেখে—
তামসীর সুগভীর মুখচ্ছবি।
প্রত্যূষ প্রাণীর অস্তিত্ব
বিলুপ্ত করে রাত্রাবাসী,
চকিত চমকে গগনবিদারী স্বরে
ভয় দেখায় সহোদরাকে—
যে ছিল একদা তার বান্ধব—
শ্যামলী।

ভাবী প্রতীকের মতো
মেরুন পতাকা নিয়ে,
দোসর হারা তামসী তার
অসহায়তার বাণী, দিনলিপি...,
রুদ্ধ মনের রোদন, গ্লানি
আলোর চোখে জানায়—
আমাকে।
তারপর, সীমানার দূরদিগন্ত পারে........

তরুণ দত্ত
প্রথম বর্ষ, পদার্থ বিদ্যা (সাম্মানিক)

বাঁচতে চাই

আমি রাজীব,
এই ওয়ার্ডের দাদা।
জানেন সিস্টারেরাও আমায় ভয় করে।
চেয়ারে বসলেও বারণ করার সাহস নেই।
আমিই পেশেন্টের ভালোমন্দের খবর দিই।
আমিই কোন পেশেন্টকে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে
তার উপদেশ দিই।
আমিই সমস্ত পেশেন্ট-ফাইল চেক্ করি।
আমিই ফাইল দেখে বলে দিতে পারি কোন
পেশেন্ট কতটা অস্বাভাবিক।
আমিই সেই ছেলে যাকে সিস্টারেরা ডেকে
চা খাওয়ায়।
আমিই, আমিই এই ওয়ার্ডের দাদা।
আবার আমিই নতুন পেশেন্টের জন্য কম্বল এনে দিই।
কারোর কিডনি চেঞ্জের খবর এলে সবথেকে
বেশি আনন্দ আমিই পাই।
হয়তো এই শুভদিন আমারও আসবে,
যার পর থেকে বাড়ি; দাদাগিরি লাটে তুলে।
বাইরের মুক্তাঙ্গন—মুক্তবাতাস, দুটো চোখ, একছুট।
—ভয় পাই।
আমি তো এখন সুস্থ, সবল;
আমি হাঁটতে পারি—খেলতেও;
ফিরে পাবো কি?—ভয় পাই।
বাথরুমের জানালা দিয়ে বাইরে দেখা—শান্তি।
হাতছানি দেয় বাইরের বাতাস,
বাতাস থেকে মহাশূন্য।
বাইরের ব্যস্ত জীবন।
অন্ধকার ভবিষ্যতের হাতছানি।
নিরুপায়, কান্না, বাতাস—মহাশূন্য।
মরুভূমি চোখ।
নিরন্তরে ব্যর্থ চেষ্টা। বাঁচতে চাই...
শুনলো বাতাস। বাতাস থেকে মহাশূন্য—কেউ না।
কালো মেঘ, স্তব্ধ, অন্ধকার
আর হাতছানি। আর কিছু দিন।
দুটো বছর একই বেড। আসলে
কিডনির অভাব।
খোঁজ চলছে।... কে দেবে?
একটা কিডনি দেবেন।
দিন না একটা কিডনি এনে।
রাজীব সরকার, P. G. Hospital MRU, Bed No-5, Blood
Group A'

রনজীব ঘোষ, বি এস সি (কেমিস্ট্রি, অনার্স)

জয় হিন্দুত্ব (নয়া)

"বার কর, টেনে বার কর
সব ছেলেগুলোকে কুপিয়ে মার,
মেয়েগুলোকে ঝোপের ধারে নিয়ে যা,
জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম।"

এই হল হিন্দুত্ব—
থুড়ি, নয়া হিন্দুত্ব।

এইটাই তো হিন্দুত্ব?
এমন মহান হিন্দু ধর্ম আর কখনো দেখা গেছে?
হিন্দুত্বই শেখায় এইরকম অসহিষ্ণুতা
অন্য ধর্মের প্রতি এত তীব্র ক্ষোভ, বিদ্বেষ—
এই না হলে হিন্দু—
থুড়ি, এটাই তো নয়া হিন্দুত্ব।

হিন্দু ধর্মই শেখায় গোধরা কাণ্ডের
প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হাজার হাজার মুসলিম
নরনারীর হত্যা
হিন্দুধর্মই শেখায় শত শত মুসলিম নারীর ধর্ষণ
শেখায় অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের পেটের ভেতর
ত্রিশূল ঢুকিয়ে ভ্রূণহত্যা
সাবাস!
গুজরাটের নয়া হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী শাসক
জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম
জয় গুজরাট লাইন
—জয় নয়া হিন্দুত্ব।

আসুন,
আমরা এগিয়ে আসি—আমি আপনি সকলে
সমবেত ধিক্কার জানাই এই নয়া
হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের
আসুন আমরা পাশে দাঁড়াই
গুজরাটের হাজার হাজার অসহায় নর-নারীর
আর বাহবা জানাই
শত শত হর্ষ মান্দারদের।।

শৌভিক গোস্বামী
প্রাক্তন ছাত্র (ইংরাজী অনার্স

মার্কিনীদের প্রতি

"ওঁরা খুশি হতেই পারেন/যাঁরা বিশ্বাস করেন মার্কিনীদের কাছে দুনিয়ার উপর দখলদারী করার ঈশ্বরদত্ত সনদ আছে/যাঁরা বিশ্বাস করেন চন্দ্র-সূর্যও মার্কিন নাগরিক।।"

মার্কিনীদের বলছি— তোমরা একটা জিনিস আমাদের দারুণ শিখিয়েছ, যে দুনিয়ার পুঁজিপ্রভুদের মর্জিমতো সিলেবাসে—'সত্যমেব জয়তে'-র স্থান waste paper basket-এ। সেখানে মাথা নোয়ানোই রীতি—ঘাড় সোজা রাখা অমার্জনীয় অপরাধ। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো টোমাহক বা ক্রুইজের লেলিহান শিখায় ঝলসে যাওয়া অবর্ণনীয় যন্ত্রণাকাতর মানুষের মুখগুলো? "মার্কিন হানাদার ইরাক ছাড়োর" প্রতিবাদ শ্লোগান কি তোমাদের কানে পৌঁছেচ্ছে? নাকি তোমাদের কাছে আজ শুধু ইরাকের স্বাধীনতা উৎসব? C.N.N. বা B.B.C-র দৌলতে সারা বিশ্ব দেখছে সেই স্বাধীনতার ছবি। সেই স্বাধীনতা—যা এসেছে B-52 বোমারু বিমানের ডানায়; প্রিশিসন গাইডেড মৃত্যুবাণের ফলায়, অ্যাম্ফিবিয়াস অ্যাব্রাম ট্যাঙ্কের চাকা মাড়ানো পথে। অদ্ভুত এই স্বাধীনতা—পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈল সমৃদ্ধ দেশের তৈল উৎপাদন বা বন্টনের অধিকার আর তাদের নেই। ইরাকের শাসনভার ন্যস্ত কলিন পাওয়েল, টমি ফ্র্যাঙ্কস বা র‍্যামসফিল্ডের হাতে—এটাই স্বাধীনতা। যাদের কালো থাবা ছিনিয়ে নিল প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশুর জীবন—আজ তারাই মুক্তিদাতা। যারা আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট, ব্লিকস রিপোর্টের কোন তোয়াক্কাই করে না—তারাই গণতান্ত্রিক! একহাত যারা রাখে ফৌজি ডিকটেটর মুশারফের মাথায়, আবার অন্যহাতে আগলায় মধ্যযুগীয় সৌদি রাজতন্ত্রকে—তাদের জন্যই কিছু বলা দরকার।

আসলে আজ তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলো এক জটিল রোগে আক্রান্ত—ক্রনিক অ্যামনিশিয়া অর্থাৎ জটিল স্মৃতিভ্রংশ। অনেক কিছুই আমরা সময়ে অসময়ে ভুলে যাই। যেমন আমরা ভুলে গেছি কাদের মদতে নিকারাগুয়ার কন্ট্রারা দেশের মাটি রক্তে লাল করছিল; কাদের দয়ায় agent arange নামক মারণ রাসায়নিকের ছোঁয়ায় ভিয়েতনামের ৫ লক্ষ শিশু বিকলাঙ্গ আমরা তা মনে রাখি না; আমাদের মনে নেই হিরোশিমা বা নাগাসাকির ঘটনা; ভুলে গেছি আফগানিস্তানকে ক'দিন আগে কারা ফেরত পাঠাল প্রস্তর যুগে—সবচেয়ে বড় কথা তাবৎ তাবৎ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেশটার নাম আমাদের পেটে এলেও মুখে আসে না। অন্যের উপর শত বিধিনিষেধ আরোপ করে নিজের ঘরে ৬০০০ neuclear বোমা আর মিসাইল মজুত রেখে এবং যুদ্ধ খাতে ১৯৪৫ এর পর প্রায় 4 trillion dollar খরচ করে কে যেন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়? তারাই আবার এককণা জৈব বা রাসায়নিক গণবিধ্বংসী অস্ত্রের হদিশ না পেলেও বলে—"সাদ্দাম শয়তান।" তবে এটা আমাদের হয়তো বা মনে আছে যে ওরাই কোন মহিলাকে আজও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়াতে দেয়নি; কোন বাদামী বা কালো চামড়ার মানুষকে White House -এ পা রাখতে দেয়না; ৮ বছর গান গাইতে দেয় না Pol Robson-কে—আর 'সাম্যবাদী' হবার অপরাধে ঘাড় ধাক্কা দেয় Charlie Chaplin-কে।

এহেন লক্ষ্মী America কেন যে হঠাৎ ইরাক আক্রমণ করল তা আমাদের শুনতে নিষেধ জানতে মানা। ইরাকের মহিলারা সুন্দরী; সাদ্দামের বাথরুমে সোনার কল—এসবের জন্যই আক্রমণ? এঁহে—পচা রসিকতা। মূল কারণ একটাই—সাদ্দাম অপরাধী। তা সাদ্দামের অপরাধের ফিরিস্তিটা একবার দেখা যাক :—

(১) সাদ্দাম মৌলবাদের প্রসার রুখতে নাজাফ্-এর ধর্মশাস্ত্র মহাবিদ্যালয় বন্ধ করে দেন।
(২) ভারতের হিন্দু জনসংখ্যার চেয়ে অনুপাতে বেশী মুসলমান থাকলেও ইরাক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।
(৩) সাদ্দাম ভূমি সংস্কারের সাথে সাথে প্রাকৃতিক সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করেন।
(৪) সাদ্দাম ব্রিটিশ এবং মার্কিন Oil Corporation-এর জাতীয়করণ করেন।
(৫) সাদ্দাম সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের সম্মানযোগ্য বেতনহার চালু করেন।
(৬) সাদ্দাম শিক্ষাকে প্রাথমিক পর্যায় কে উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্র পর্যন্ত অবৈতনিক করে দেন।
(৭) মহিলাদের 'সমকাজে সমবেতনের' সুযোগও দেন তিনি।

—এইসব তো সত্যিই ক্ষমাহীন অপরাধ। আর মারাত্মক অপরাধ হল ইরাকের তৈল সম্পদ—এহেন তেল মানুষগুলো করে কি? আর তাইজন্য

"যদি বেল পায় ন্যাড়ারাও যায় বারবার যেন বেলতলায়
ভিয়েতনামের ন্যাড়া মার্কিনী যাচ্ছে এবারে তেলতলায়।।"

তবে আমরাই ভাল আছি (???) একদিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলে অপপ্রচার চালালেও দেশটার সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষামিশ্রিত শ্রদ্ধা আজও আমাদের রক্তে। তাই ওদের থেকে রপ্ত করেছি বেপরোয়া ভণ্ডামি; অবিরত মিথ্যাচার; উপলব্ধিহীন উচ্চারণ, আর আপোষের সহজ কলাকৌশল। কিন্তু আজও সে দেশের হাজার হাজার মানুষ যুদ্ধবিরোধী মিছিলে যোগ দেয়; বন্দুকের

নলের সামনে গিটার হাতে গান গায় বব ডিলান বা পিট সিগাররা; এদেশেই জন্মান আব্রাহাম লিঙ্কন বা আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। আমরা যদি গণ্ডারের চামড়ার মানুষ হতাম তা হলে স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারে ডুবে থাকা যেত—কিন্তু আজও সব শেষে কথা বলে সাধারণ মানুষ। সেই সাধারণ মানুষ ভারত, আমেরিকা বা অন্য কোন দেশে আলাদা নয়।

N.B. 'হীরক রাজার দেশে'-র মগজ ধোলাই যন্ত্রের গোপন ফর্মুলা যদি মার্কিন পুঁজি প্রভুরা এর মধ্যে পেয়ে যায়—আর আমাদের মগজ থেকে বিবেক, চেতনা, মনুষ্যত্ব ইত্যাদিকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেয়, তখন আমরাও অক্লেশে বলব

"ভগবান কত ভালো,
অপরের চোখ অন্ধ করেও আমাকে দিলেন আলো।।"

সৌম্যদীপ বসু
রসায়ন (প্রথম বর্ষ)

COLLEGE LIBRARY
ESTD-1916

দেশ ও দেশের নায়ক

একে একে ফ্রান্সের যাজক ও জমিদার সম্প্রদায় আইনসভার কক্ষ ত্যাগ করে চলে যায়। সেখানে বসে থাকে কেবল দীনদরিদ্রের নেতারা। তারা বিস্মিত চোখে চেয়ে আছে তাদের নেতা মিরাবোর মুখের দিকে। কি আদেশ করেন তিনি সকলেই তা শোনবার জন্য উদ্গ্রীব। কিন্তু মিরবোর কাছ থেকে কোনও নির্দেশ আসে না। সামান্য কথা বলবার শক্তিটুকুও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ঠিক এমনি সময় রাজার আদেশে প্রহরী তূর্যধ্বনি করে উঠল। উচ্চস্বরে প্রহরীরা ঘোষণা করল আইন-সভার প্রহরী এসে তাদেরকে জানিয়ে দেয় সভাকক্ষ ত্যাগ না করলে রাজ আদেশে তাদেরকে বন্দী করা হবে।

মিরাবো তাঁর দলের লোকেদের নিয়ে চলে আসেন আইনসভার নিকটবর্তী এক প্রান্তরে। তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে আসে এক গম্ভীর বাণী। তিনি বলেন, ভাইসব—আমরা পাইনি ক্ষুধার রুটি, পরিধানের বস্ত্র, কাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রুটি খেয়ে আমরা আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছি। সারা দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত। আর তাতে প্রাণ আহুতি দিচ্ছে আমাদের মতই অসহায় প্রজা, আশা ছিল রাজা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন, কিন্তু তিনি। তিনি আজ আমাদের সাথে করেছেন বেইমানি। এখন আমরা রাজার কাছে চাইব আমাদের বাঁচবার ন্যায্য অধিকার।

মিরাবোর বক্তৃতার পর সমবেত জনতা প্রতিজ্ঞা করে, তারা আর এই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করবে না। পরের দিন দলে দলে লোকযাত্রা করে ভার্সাই এর উদ্দেশ্যে। রুটি চাই ধ্বনি তুলে তারা জমায়েত হল ভার্সাই এর রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গনে। ষোড়শ লুই তখন বিলাসে মগ্ন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজাকে দেখা করতে হ'ল এই ভুখা মিছিলের সঙ্গে। তাদের অভিযোগ শুনে রাজা বলেন—আমার কাছে এত খাবার নেই যা আমি তুলে দিতে পারি তোমাদের মুখে। আমি নিরুপায়।

কে বললে রাজা তুমি নিরুপায়? দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা তুমি। দেশের শত শত লোক যখন খাদ্যাভাবে, বস্ত্রাভাবে কবরের তলায় আশ্রয় নিচ্ছে, তখন তুমি তো নিশ্চিন্তে বিলাসে কাল কাটাতে পারো না। তোমাকে নেমে আসতে হবে এই পথের ধুলায়, যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজা আর রাণী নেমে আসতে বাধ্য হন— যেতে হয় তাদের রাজধানী প্যারীর অভিমুখে বিচারসভা বসে, বিচারকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে রাজার প্রাণদণ্ডের আদেশ। নায়ক মিরাবো চেয়েছিলেন তাদের নির্বাসিত করতে। কিন্তু জনগণ চায় প্রতিশোধ। রাজরক্ত প্লাবিত হয় রাজপথে। প্রজাতন্ত্রের জন্ম হল ফ্রান্সে। তারই প্রভাব ছড়িয়ে পরল ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বে।

পরের ঘটনাটি রাশিয়ার অধিবাসী ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ-এর। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। জার নিকোলাস রাশিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। শ্রমিক আর কৃষকদের প্রতি কোনই দৃষ্টি নেই তাঁর। শ্রমিকদের দিনান্তে আধপেটা খেয়ে সংগৃহীত অর্থটুকু হরণ করার জন্য ধনী মালিকেরা বস্তির পাশেই খুলে দিয়েছে মদের ঘাঁটি। ফলে শ্রমিকদের উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই ফিরে যায় ধনীদের হাতে। দেশের জন সাধারণের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে 'জারের' কোপদৃষ্টিতে পরে। কারুর বা নির্বাসন হয়েছে সাইবেরিয়ার নির্জন প্রান্তরে।

এমনিভাবে প্রাণদণ্ড হয়েছিল ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ এর জ্যেষ্ঠভ্রাতার। ভাই এর প্রাণদণ্ডে তাঁর মধ্যে দেখা দিল তীব্র প্রতিক্রিয়া, দেশের লোককে কি ভালোবাসা অপরাধ? তুলে নিলেন নিজের হাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসমাপ্ত কাজ। ফলে রাশিয়া থেকে তিনি নির্বাসিত হলেন। দেশের বাইরে থেকেও তিনি স্বদেশবাসীর জন্য ছড়িয়ে দিলেন 'অগ্নি স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকা, গোপনে সেই পত্রিকা পড়ে দেশের লোক বুঝতে পারল তারাও মানুষ, বাঁচবার অধিকার তাদেরও আছে।

এমনি সময় বাঁধলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রাশিয়া ইংরেজদের পক্ষ নিল। ফলে দেশের মধ্যে ঢুকে পরল ইংরেজ সৈন্য, খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য হল আগুন। শুরু হল বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের দমন করতে 'জার' পাঠালেন সৈন্য। কিন্তু আঘাত করতে কার বুকে? সবাই যে তাদেরই ভাই। সৈন্যদলও মিশে যায় বিপ্লবীদের সঙ্গে। বিপ্লবের সংবাদ পেয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে ছুটে এলেন ভ্লাদিমির। দেশের লোক তার নতুন নামকরণ করল লেনিন। প্রবেশ করেই তিনি প্রচার করলেন— দেশের সমস্ত জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। উচ্ছেদ করা হবে কেবলমাত্র জন্মের অধিকারে পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থের জমিদারদের। দেশ থেকে বিলুপ্ত হল জমিদার শ্রেণী। প্রতিষ্ঠিত হল সাম্যবাদ। আর জার নিকোলাস? তিনি বিপ্লবীদের গুলিতে সপরিবারে প্রায়শ্চিত্য করলেন—বুকের রক্ত দিয়ে।

এগুলি এখন ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস হলেও সত্য, ধ্রুব সত্য। সত্য ইংল্যান্ডের অধিবাসীর সঙ্গে আয়ার্লন্ডের অধিবাসীদের সংঘর্ষের মত। বৃটেনের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে একদিন কেল্টরা আশ্রয় নিয়েছিল আর্য়ালান্ডে। ইংল্যান্ডের অধিবাসীর সঙ্গে কোনদিনও মিল হল না। সুযোগ আর সুবিধা পেলেই তারা করে বিদ্রোহ। প্রতিবেশী ইংরেজ তাকে পদানত করে রাখার জন্য কঠোর হস্তে দমন নীতি চালিয়ে যায়। কেটে যায় হাজার বছর। দুর্বল আয়ার্ল্যান্ড ফেলে চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস, প্রার্থনা জানায় ভগবানের কাছে। দেশের মধ্যে গড়ে ওঠে সিন-ফিন দল। তাদের নেতৃত্ব করতে এগিয়ে আসেন আমেরিকান প্রবাসী তনয়-ডি-ভ্যালেরা। তিনি বলেন—'ইংরাজ! আয়্যার্লান্ড ছাড়ো। গড়তে দাও আমাদের জাতীয় সরকার। বন্দুকের গুলি, ফাঁসির মঞ্চ, অন্ধকার কারাগার পরাজিত হয় তাদের মনোবলের কাছে। ইংরাজ আয়ার্লান্ড ছাড়তে বাধ্য হয়। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা নেমে আসে আয়ার্ল্যান্ডের বুকে। সমগ্র দেশবাসী বলে ওঠে—জয়—ডি—ভ্যালেরার জয়।

সৌম্যজিত রায়, ইতিহাস (অনার্স)

একটি পরিসংখ্যান — একটি বাস্তব — একটি প্রয়াস

এই প্রবন্ধটি একটি প্রয়াস — প্রয়াস জাতির জাগরণের, জাতির উন্নয়নের। এটি একটি পরিসংখ্যান, যা কিনা দেশের বর্তমান শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্রের বাস্তব চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলে। বিদগ্ধ জনের উক্তি যে statistical lies are the greatest lies. কিন্তু "রাশিতথ্য মিথ্যা কভু নয়, মিথ্যাবাদী রাশিরাশি হয়।" অর্থাৎ যেটা বলার তা হল এই পরিসংখ্যানটি — বলতে পারিনা সে একশো শতাংশই ঠিক কিন্তু 95% নির্ভুল। আমি যার ভিত্তিতে এগুলি সংগ্রহ করেছি তা হল — Human Development Report, 2001, The Economic times, অর্থনীতিবিদ্ অরিন্দম চৌধুরির সদ্য প্রকাশিত 'The Great Indian Dream'।

এত প্রতিভা, এত প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ আমাদের ভারতবর্ষ অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্যের আঘাতে মৃতপ্রায় এক ভূখণ্ড। শুনতে খারাপ লাগলেও এ এক বাস্তব। তো আসা যাক্ এই বাস্তব পটভূমিতে। একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন হয়েছে তখনই বলা যায়, যখন তার শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পায়, জনসাধারণের শিক্ষার হার বাড়ে এবং গড় প্রত্যাশিত আয়ু বৃদ্ধি পায়। চীন ও কিউবাতে যদি প্রতি একহাজার জনে যথাক্রমে ২৯ ও ১৪ জন শিশুর মৃত্যু হয়, ভারতে তা ৯০ জন। আমরা প্রত্যেকেই তিনটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত, তা হল Below Poverty Line বা BPL। ভারতে এই সীমা হল গ্রামীন এলাকায় ৩৩০ টাকা মাসে এবং শহরাঞ্চলে ৪৫০ টাকা মাসে — পাঁচ জনের একটি পরিবারের। যেখানে আর্ন্তজাতিক মান হল দিনে ১ $ বা ১৫০০ টাকা প্রতি মাসে। প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মানুষ আমাদের দেশে প্রতিরাতে অভুক্ত থাকে। শুনতে অবাক লাগে আমাদের দেশে পৃথিবীর সর্বাধিক অভুক্ত মানুষ থাকলেও আমরাই পৃথিবীর সর্বাধিক খাদ্যের মজুতকারী (largest stocks of food grains) দেশ — প্রায় ৬০ মিলিয়ন টন চাল এবং গম। ৬০ মিলিয়ন টন খাদ্যদ্রব্য মজুত ভাণ্ডারে (ware house) রয়েছে Food Corporation of India — এর, যা দিয়ে দারিদ্র সীমার নীচে থাকা ৩৫০ মিলিয়ন মানুষের প্রত্যেককে 7.5 Kg করে প্রতি মাসে আগামী আড়াই বছরের জন্য দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী পাঁচ জনের একটি পরিবারকে মাসে 30 Kg দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন, পরে পুরোটাও তারা পায় না, কিছুটা চলে যায় মধ্যসত্ত্বভোগীদের দখলে। আর স্বাস্থ্য — তার অবস্থা তো শোচনীয়। 65% ভারতীয়ের প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই। ৪,৫০,০০০ জন মানুষ প্রতিবছর যক্ষ্মায় (Tuberculosis) আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং ৫ লক্ষ মারা যায় আন্ত্রিকে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর। শিশু মৃত্যু ও পোলিও-এর অভাবে পঙ্গু শিশুর কথা তো ছেড়েই দিলাম। একজন ছাত্র হিসাবে শিক্ষার কথাটা ভাবতে আরো লজ্জা লাগে। পৃথিবীতে যত অশিক্ষিত মানুষ বসবাস করে তার 30% ভারতীয়। এ এক চরম গ্লানি। যারা একদম সহজ কোনো 'instruction' পড়তে পারে বা কোনো যন্ত্রাংশ চালাতে সক্ষম — এই মাপকাঠির ভিত্তিতে তাদের 'Functionally literate' বলা হয়। ভারতে এই 'functionally literacy' এর মাত্রাও 37.5%-কে অতিক্রম করে না। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার গ্রামাঞ্চলগুলিতে গড়ে প্রতি হাজার জনে বড়জোড় চল্লিশ জন সংবাদপত্র পড়তে সক্ষম।

আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আব্দুল কালাম বলেন যে — "Aiming small is a crime"। সুতরাং এক সোনালী ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরও উচ্চতর লক্ষ্য ও আশা রাখা উচিত। স্বাধীনতা দিবসের দিন কেবল পতাকা উত্তোলন করলেই দেশপ্রেমিক হয়ে উঠা যায় না। তার জন্য চাই আদর্শ, ত্যাগ ও সঠিক কর্মপন্থা। আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে আমরা প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য স্কুল ও কলেজে যে সরকারী অনুদান পাই, তা কোটি কোটি গরীব খেটে খাওয়া মানুষেরই উপার্জিত অর্থ। যারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিদেশে পাড়ি দিতে প্রস্তুত, তারা তাদের প্রতিভা ও কর্মশক্তি এই দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করলে, তবেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। নিজের শৈশবের 'ভাঙা ঘর' ছেড়ে দিয়ে অট্টালিকায় বসবাস করে ভাঙা ঘরকে দালান করা যায় না। চেষ্টা থাকলে 'ভাঙাঘরে' থেকেই তাকে সুন্দর করে সাজানো যায়। অর্থনীতিবিদ্ অমর্ত্য সেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Poverty and Famine : An Essay on Entitlement and Deprivation" — এ বলেন যে দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য রাষ্ট্রিয় উদ্যোগই যথেষ্ট। সামাজিক সুরক্ষা, যথার্থ স্বত্বাধিকার, সুষম বণ্টন ছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিশ্বায়ন মানবজীবনে অপ্রাসঙ্গিক। শক্তিশালী গণতন্ত্র ও সুস্থ নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতাই আগামী বিশ্বে দারিদ্রের সম্ভাবনা রোধ করবে। সর্বোপরি আমাদের যুবসম্প্রদায়ের সদিচ্ছাই হয়ে উঠবে আগামী দিনের দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই-এর অস্ত্র, সোনালী ভবিষ্যতে পদার্পণের মানচিত্র।

"Ask not what your country
can do for you – ask what
you can do for your country ...."
– John F. Kennedy

দেবাশীষ ঘোষ, অর্থনীতি বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

আদিবাসী তথা সাঁওতাল সমাজের জীবন

"হায় ছায়াবৃতা
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৃষ্ণ মহাদেশ আফ্রিকার বেদনা ভারতীয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে। কালো ছেলের হৃদয়ের সত্যিকারের পরিচয় তারা পায়নি যাদের দৃষ্টি উপেক্ষায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। সভ্য ভারতবর্ষও তার অরণ্যচারী কালো ছেলেকে ঠিক আপন বলে কাছে টেনে নিতে পারেনি। একটা অদৃশ্য গন্ডী দিয়ে সৎ ছেলের মত তাকে সবসময় দূরে সরিয়ে রেখেছে, আর তাদের 'কালিপ্রজা' আখ্যা দিয়ে অবহেলা করেছে।

ভারতের আদিবাসী সমাজকে বেশীরভাগ সময়ই পাহাড়িয়া, বুনো, জংলী ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের আদিবাসীদের যে একটা সুন্দর-নিজস্ব সংস্কৃতি আছে সে সম্বন্ধে কোন সশ্রদ্ধ ধারণা সাধারণত আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় পোষণ করে না। কারণ সে সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর তারা রাখেন না। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে ঠিক অন্যান্য সমাজের মতোই আদিবাসী সমাজেরও একটা ঐতিহ্য আছে। যা একেবারেই একান্ত — নিজস্ব সংস্কৃতি। বিশ্বায়নের হাওয়া এখনও এদের সংস্কৃতিতে লাগেনি। তবে পরিবর্তন হয়তো কিছু হয়েছে। কোথাও অনড় প্রাচীন ব্যবস্থা ও বিধানের মধ্যে এরা অচল হয়ে আছে, কোথাও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য্যকে হারিয়ে এরা আগের তুলনায় দীন হয়ে পড়েছে এবং কোথাও বা আধুনিক যুগের রীতি-নীতির সঙ্গে কিছুটা খাপ-খাইয়ে একটা পরিবর্তনকে বরণ করে নেবার চেষ্টা চলছে। তবু নিজস্ব সংস্কৃতি - রীতি-নীতিকে তারা বাইরের হাওয়া থেকে রক্ষা করে চলেছে আজও।

ভারতের জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হল আদিবাসী মানুষ। ভারতে এদের জনসংখ্যা প্রায় আট কোটি। এদের আবার আদিম জাতি, আদিবাসী, গিরিজন ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে এরা পরিচিত তফশীলি উপজাতি বা Scheduled Tribe নামে। "কাককৃষ্ণ হ্রস্বাঙ্গ হ্রস্ববাহু মহাহনু, হ্রস্বপানি নিম্ননাসাগ্র রক্তাক্ষ তাম্রমূর্দ্ধজ" — ভাগবত পুরান ভারতের আধিবাসীকে সবদিক দিয়ে একেবারে হ্র স্ব করে ছেড়েছে। বলা বাহুল্য, এধরণের উক্তি প্রাচীনকালের জাতি-গর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গাত্র-বর্ণের গর্ব আমাদের নিম্নজাতি, উচ্চজাতির ভেদাভেদ স্মরণ করিয়ে দেয়।

আদিবাসীদের দৈহিক গঠন, মুখাকৃতি, ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে —

১. নিগ্রোবটু (Negroito) — দক্ষিণ ভারতের কাদার, ইরুলার এরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আন্দামানী, জারওয়া, ওঙ্গো প্রভৃতি গোষ্ঠী এ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।
২. মঙ্গোলীয় (Mongoloid) — লেপচা, টোটা, রাভা, চাকমা, মগ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। নেপাল, ভুটান ও চীনের জনগোষ্ঠীর সাথে এদের গোষ্ঠীগত মিল আছে।
৩. প্রোটো — অস্ট্রেলীয় জাতি (Proto – Australoid) — ভারতের সমগ্র মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে এদের বাস। মধ্য ও পূর্ব ভারতের ওরাঁও, মুন্ডা, সাঁওতাল, কোল, ভীল, লোধা, শবর এ গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

ভাষা অনুযায়ী আদিবাসীদের চার ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

১. অস্ট্রো - এশিয়া / অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী — সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, কোরবু, খাড়িয়া, শবর জাতি এই ভাষা ব্যবহার করে।
২. দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী — ওরাঁও, টোডা, গোন্ড, খোন্দ এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।
৩. তিব্বতী-চীনা ভাষা গোষ্ঠী — লেপচা, টোটো, চাকমা, মেচ, রাভা, ভুটিয়া এই ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।
৪. ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠী — খারওয়ার, গরেয, বেদিয়া, বৈগা, লোহরা এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ আদিবাসী পশ্চিমবঙ্গে বাস করে। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। সাঁওতালরা সাধারণত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, মালদা, বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম, হুগলী প্রভৃতি জেলায় বাস করে। আচার্য সুনীতি কুমারের ব্যাখ্যা অনুসারে 'সাঁওতাল' শব্দটি সামন্ত-পাল শব্দের অপভ্রংশে। সামন্তপাল অর্থাৎ সীমান্ত-রক্ষক। আবার অনেকে মনে করেন মেদিনীপুরের 'সাওন্ত' বা 'সাঁত' কথা থেকেই সাঁওতাল নামটি এসেছে।

আদিবাসীদের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখা দরকার ভারতবর্ষের আদি বসবাসকারি মানুষই আদিবাসী। আর্যদের এদেশে আগমনের ফলে আদিবাসীরা কার্যত বিতাড়িত হয়। তাদের আশ্রয় হয় বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে। এর ফল অবশ্য একদিকে ভাল হয়েছে। তারা তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে। আজও তাদের জীবন ধারণের রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, আচার-বিচার প্রভৃতির মধ্যে এক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রতা বজায় আছে। আজও তাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি ছন্দে আদিম সংস্কৃতির ছাপ পাওয়া যায়। আদিবাসী মাত্রই প্রকৃতির সন্তান ও প্রকৃতির পূজারী। তাই তাদের প্রতিটি কাজ-কার্যে, বিবাহে-উৎসবে প্রকৃতি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি হল সাঁওতাল, মুন্ডা, কোড়া, মাহলি, শবর প্রভৃতি, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। সাঁওতাল সমাজ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমি তুলে ধরতে চাই—

১. বাসস্থান ও ঘরবাড়ি — বনজঙ্গল বা নদীর কাছাকাছি বা পাহাড়ের পাদদেশে সাধারণত সাঁওতালরা গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে। বাড়িঘর সাধারণত মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি হয়। গ্রামের বাইরে শালকুঞ্জ থাকে যাকে 'জাহের থান' বলা হয়। মারাংবুরু, জাহের এরা, মঁড়েকো তুরুইকো, গসাঁয় এরা এবং অন্যান্য দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে এখানে পূজো করা হয়। এদের গ্রামের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল 'মাঁঝি-থান'। মাঁঝি বা গ্রাম প্রধানের বাড়ির কাছেই এই 'মাঁঝি-থান' থাকে। এদের ঘর-বাড়ি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। বাড়ির উঠোন ও দাওয়া প্রত্যহ গোবর দিয়ে নিকোনো হয়। ঘরের দেওয়ালে বিভিন্ন রঙের নক্শা ও ছবি আঁকা থাকে। এরা নিজস্ব পদ্ধতিতে বিভিন্ন রঙ তৈরি করে এবং ছবি আঁকে ও ঘর রঙ করে। বাড়িতে পোষা গরু, মহিষের জন্য আলাদা গোয়াল ঘর থাকে।

বর্তমানে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের বাসস্থান ও ঘরবাড়ির পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকেই এখন শহরাঞ্চলে বসবাস করে এবং মাটির বাড়ির পরিবর্তে পাকা বাড়িতে বাস করে।

২. আসবাবপত্র ও পোষাক পরিচ্ছদ — সাঁওতালরা সাধারণত বেশি আসবাবপত্র রাখা পছন্দ করে না। তালপাতা কিংবা খেজুর পাতার মাদুর এবং দড়ির খাটিয়া প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দেখা যায়। লোকজন, আত্মীয়-স্বজন এলে খাটিয়া পেতে দেওয়া হয়। রান্নাবান্নার জন্য সাধারণত মাটির হাঁড়ি-কলসি ইত্যাদি ব্যবহার হয়। খাওয়া দাওয়ার জন্য কাঁসার বাসনপত্র, বেশি ব্যবহার হয়। বাঁশের ঝুড়ি, চালুনী, কুলো প্রত্যেক বাড়িতেই থাকে। এছাড়া প্রতি বাড়িতেই কৃষিকাজের উপকরণ এবং শিকারের সাজ-সরঞ্জাম থাকে। তবে বর্তমানে মাটির বদলে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র ও কাঁসার বদলে স্টেনলেস স্টিলের বাসনপত্র ব্যবহৃত হয়।

সাঁওতালদের পোষাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। আগেকার দিনে পুরুষেরা পাঁচ-ছয় হাতের মোটা কাপড় পরতো। মেয়েরাও মোটা কাপড়ের শাড়ী ব্যবহার করতো। মেয়েরা সাধারণত লাল পাড়ওয়ালা শাড়ী বেশী পছন্দ করে। তবে বর্তমানে তাদের আর এ পোষাকে দেখা যায়না। আধুনিক যুগে ছেলেরা প্যান্ট শার্ট ও মেয়েরা শাড়ী চুড়িদার পরছে।

মেয়েরা অলঙ্কার পরে সাজগোজ করতে বেশী ভালোবাসে। রূপোর অলঙ্কারই তারা বেশী ব্যবহার করে। অলঙ্কারের মধ্যে রূপোর হাঁসুলী, বালা, বাজু, চুর, কানের রিং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবস্থাপন্ন পরিবারে আজকাল সোনার অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায়। উৎসব অনুষ্ঠানে মেয়েরা মাথায় ফুল লাগায়। সমাজে উলকির প্রচলন আছে। উলকি বর্তমান সময়ের ট্যাটুর মত। পূর্বে মেয়েরা নিজেদের সুন্দর দেখাবার জন্য গলায়, হাতে, কপালে বিভিন্ন নকশার উলকি আঁকতো। ছেলেরাও বাম হাতে বিজোড় সংখ্যক অর্থাৎ তিন, পাঁচ, সাত বা নয়টি 'শিকা' নিতো। শিকার দাগ টীকার মত। তবে বর্তমান সময়ে উলকি বা টীকার প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে।

৩. জীবিকা — কৃষিকাজ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ এদের প্রধান জীবিকা। কৃষিকাজে স্ত্রী ও পুরুষ সমানভাবে জমিতে কাজ করে থাকে। যাদের নিজস্ব জমি নেই তারা অপরের জমিতে ক্ষেত মজুর হিসেবে কাজ করে। বনসম্পদ সংগ্রহ সাঁওতালদের জীবিকা নির্বাহের একটি বড় উপায়। শালপাতা, কেন্দুপাতা, শালবীজ ইত্যাদি বাজারে বিক্রি করে বহু পরিবার জীবিকা নির্বাহ করে। শিকার এককালে এদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। কিন্তু বর্তমানে বন্যপশু কমে যাওয়ায় এবং সংরক্ষণের জন্য শিকার প্রায় নেই বললেই চলে। তবুও বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষত ফাল্গুন-চৈত্র (Feb-April) মাসে গ্রামের যুবকেরা দল বেঁধে জঙ্গলে শিকার করতে যায়। কোন জন্তু শিকার হলে সবাই সমান ভাগ পায়। বর্তমানে এদের জীবিকারও পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ-এ কাজ করছে। বর্তমানে বহু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও এদের মধ্য থেকে আসছে।

৪. গ্রাম সংগঠন — সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সাঁওতালরা তাদের গ্রাম-সংগঠনকে অনেকখানি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গ্রাম-সংগঠনের নির্দেশ কেউ অমান্য করে না। অসামাজিক আচরণ বা সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে গ্রাম-সংগঠনের নির্দেশে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

প্রতি গ্রামেই তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থাকে। গ্রামের উৎসব-অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা, ঝগড়া-বিবাদ সুষ্ঠ ভাবে

মিটমাট, সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা এই পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত থাকে। পঞ্চায়েত সভায় নিম্নলিখিত পদাধিকার ব্যক্তি থাকেন—

১. মাঁঝি — গ্রামের সর্বময় কর্তা বা গ্রাম প্রধান। গ্রামের সবরকম দায়িত্ব এর উপর ন্যস্ত থাকে। জন্ম-মৃত্যুর পর সামাজিক কাজকর্ম, বিবাহ, পূজা, উৎসব মাঁঝির নির্দেশে সম্পন্ন হয়।
২. জগমাঁঝি — গ্রামের মানুষদের নৈতিক চরিত্র লক্ষ্য করার দায়িত্বে থাকেন।
৩. পারানিক — মাঁঝির সহকারী। মাঁঝির অবর্তমানে ইনি কাজ পরিচালনা করেন।
৪. জগ-পারানিক — জগমাঁঝির সহকারী।
৫. গোডেত — মাঁঝির বার্তাবাহক। মাঁঝির নির্দেশ গ্রামের লোকজনের কাছে পৌঁছে দেন।
৬. নায়কে — গ্রামের পূজারী।

গ্রামের পত্তনের পর এই গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠিত হয় এবং বংশানুক্রমিক পঞ্চায়েত সদস্যরা এই ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। গ্রামের মধ্যস্থলে কোন গাছতলায় গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভা বসে। গ্রামের মাঁঝি কোন সমস্যা সমাধান করতে না পারলে 'পারগানা' আমন্ত্রণ করা হয়। দশ-বারোটি গ্রাম নিয়ে একটি 'পারগানা' গঠিত হয়ে থাকে। এবং এর দায়িত্বে যিনি থাকেন তাকে 'পারগানা' বলা হয়। পারগানার সহকারীকে ' দেশ-মাঁঝি' বলা হয়। 'শিকার-বৈঠক' বা 'ল-বির' সাঁওতালদের সর্বোচ্চ বিচারালয়। বাৎসরিক শিকারের সময় ঐ বৈঠক বসে। বৈঠকের পরিচালক ও বিচারক 'দিহুরি', মাঁঝি বা পারগানার বিচার কারো মনঃপুত না হলে সে এই শিকার বৈঠকে তা তুলে ধরতে পারেন এবং দিহুরি সবাই-এর মতামত নিয়ে সমাধান করে দেন।

আজকের সাম্যবাদী সমাজ কল্পনার বহু আগে থেকেই সাঁওতাল সমাজের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার আদর্শ প্রচলিত ছিল। সবথেকে বিস্ময়ের কথা এই যে সাঁওতালরা অনাদিকাল থেকে এই অতি আধুনিক গণতান্ত্রিক বিধি ও বিধানগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে আসছে।

৫. বিবাহ — সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। ছেলে মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে মাতা পিতারা পাত্র-পাত্রী ঠিক করে দেয়। বিবাহে ঘটকের বিশেষ ভূমিকা আছে। সাঁওতালদের বিবাহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল পণপ্রথা। বিবাহের সময় পাত্রপক্ষ কন্যা পক্ষকে পণ দেয়। স্থান বিশেষে এই পণ বিভিন্ন ধরনের হয়। সাধারণত ৭, ১৪ অথবা ২১ টাকা দিতে হয়। পাত্রপক্ষের তরফ থেকে কন্যাপক্ষের বাড়িতে যৌতুক হিসেবে বাছুর দিতে হয়। সমাজে বহু ধরনের বিবাহ প্রচলিত আছে—

১. কিরিঙ বীহু বাপলা — স্বাভাবিক ভাবে বিবাহ যোগ্য পাত্র-পাত্রী অনুসন্ধান করে উভয় পক্ষের কথাবার্তা হয়ে এ বিবাহ হয়। এই বিবাহ পদ্ধতিই বর্তমানে সব চেয়ে বেশি প্রচলিত।

নিম্নলিখিত বিবাহ পদ্ধতি অতীতে থাকলেও বর্তমানে আর দেখা যায় না।

২. টুঙকি দিপিল বাপলা — যাদের ঘটা করে বিবাহের সামর্থ নেই তাদের এই ধরনের বিয়ে হয়ে থাকে।
৩. অর আদের বাপলা — এই শ্রেণীর বিবাহের হিন্দু শাস্ত্র মতে নাম রাক্ষস বিবাহ। এই বিবাহে ছেলে জোর করে মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়।
৪. ত্রির বল বাপলা — ছেলে মেয়ে নিজের পছন্দের পর বাড়িতে মত না দিলে নিজেরাই জোর করে বিয়ে করে। মেয়ে জোর করে ছেলের বাড়িতে প্রবেশ করে।
৫. ইত্যুৎ সিন্দুর বাপলা — ইত্যুৎ হচ্ছে একরকম জোর জবরদস্তি মূলক বিয়ে। অভিভাবক আপত্তি করলে ছেলে মেয়ের সিঁথিতে জোর করে সিঁদুর ঘষে দেয়।
সাঁওতাল সমাজে যদি কোন ছেলে, মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর বা ধুলোও লাগিয়ে দেয় তবে মেয়েটি ছেলেটির স্ত্রী বলে বিবেচিত হবে।
৬. সঙ্গা — বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে।

৬. ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবী — সাঁওতালরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী নয়। এরা প্রকৃতির পূজারী। এদের বড় দেবতা 'মারাঙ বুরু'। প্রতি উৎসবে এরা 'মারাঙ-বুরু'-র উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করে। এদের আর এক উপাস্য দেবতা হলেন 'জাহের এরা'। এছাড়া প্রায় প্রতিটি বাড়িতে পারিবারিক দেবতা (অজঃ বঙ্গা) আছে। সাঁওতালদের ধর্ম 'সারি-ধরম'।

অন্যান্য সমাজের মত এই সমাজেও ভূত, প্রেত কিংবা অপদেবতার ধারণা আছে।

৭. উৎসব ও অনুষ্ঠান — সাঁওতালরা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকে। দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র করে এই উৎসবের সৃষ্টি। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎসব বাহা (ফুল) উৎসব। 'বাহা' সাঁওতালদের অতি পবিত্র ধর্ম-বিষয়ক উৎসব ফাল্গুন মাসে শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথি থেকে 'বাহা' আরম্ভ হয়। দুদিন ধরে এ উৎসব পালিত হয়। বিশেষ ভাবে শালগাছের উদ্দেশ্যেই এ পূজা হয়। প্রথাগত উল্লেখ্য যে শালগাছ আদিবাসীদের কাছে অতি পবিত্র গাছ। শালগাছকে সত্যের প্রতীক

হিসাবে ধরা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে হয় 'সাকরাত' উৎসব এই সময় বাড়িতে বাড়িতে পুজো হয় এবং পুজোর ভোগ হিসেবে পিঠা, চিড়া, মুড়ি প্রথমে মারাঙ-বুরুকে উৎসর্গ করার পর খাওয়া হয় এবং অন্যান্যদের দেওয়া হয়। এদের আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব হল 'মারমড়ে'। পাঁচ বছর অন্তর বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে এ উৎসব পালিত হয়। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য এ উৎসব হয়। ফসল কাটার পর পৌষ মাসে বড় উৎসব 'সহরায'। সাধারণত পাঁচদিন ধরে এ উৎসব পালিত হয়। এ সময়ে গৃহপালিত গবাদী পশুর কল্যাণ কামনা করে জাগরণী গাওয়া হয়। এ সময়ে নাচ-গান, আনন্দ, উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে সময় কাটানো হয়।

এসব উৎসব ছাড়াও দাঁসায় (আশ্বিন মাসে), কায়াম (ভাদ্র মাসে) ফসল বোনার উৎসব 'এরঃ-সিম' (আষাঢ় মাসে) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদের আর একটি বিশেষ উৎসব শিকার-উৎসব। প্রতি বছর এ উৎসব পালিত হয়। নির্দিষ্ট দিনে শিকারীরা উপস্থিত হয় গ্রামের চৌমাথায়। সঙ্গে থাকে তীর-ধনুক, বর্শা, বল্লম ইত্যাদি। অযোধ্যা (পুরুলিয়া) শিকারে যাবার পূর্বে শিকারীরা তাদের স্ত্রীদের হাতের নোয়া খুলে দিয়ে যায় এবং ফিরে এলে আবার হাতে, নোয়া পরিয়ে দেয়। এ সময় তাদের স্ত্রীরা সিঁদুরও পরে না।

আদিবাসী সমাজ আজকে সবথেকে বেশি জমিচ্যুত এবং জঙ্গলের উপর অধিকার হারিয়েছে। তবু আজকের দিনে সব থেকে শ্রমসাধ্য কাজ— রাস্তা তৈরি, ব্রিজ তৈরি, কয়লা খাদে কাজ তারাই করে। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা থাকলেও এরা নিজেদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সচেতন। বর্তমান সরকারের সহায়তায় আজ এরা অনেক অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সমাজের বৃহত্তর অংশ আজও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা কিছুমাত্র পায়নি। সমাজের সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানের আলো সঠিক ভাবে প্রবেশ না করায় এখনো 'ডাইন' প্রথার মত বর্বর প্রথা এখনও ঘটে থাকে। কিন্তু এ তো আমাদেরই দোষ। আমরাই তাদের মধ্যে সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দিতে পারিনি। তবু এ সমাজে কন্যা সন্তান জন্মানোকে অপরাধ বলে ধরা হয় না। আজও এ সমাজে পণের জন্য কোন বধূকে পুড়িয়ে মারা হয় না।

আদিবাসী সমাজ বিশেষ করে, সাঁওতাল সমাজ স্বাধীন ভারতে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে চায়, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তা হয়ে উঠছে না। নানারকম বাধা তাকে আটকে রাখছে। সবচেয়ে বড় বাধা তার পরিবেশ। যদিও আজকের ছেলে মেয়েরা এগিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, এ সময় প্রতিবেশী সমাজগুলোর সহযোগিতা পেলে তারা নিশ্চিত সফল হবে বলে আশা করা যায়।

সবশেষে রবীন্দ্র কথাতেই আমাদের মনে রাখা দরকার—

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—
(১) ভারতের আদিবাসী
(২) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ
(৩) বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী রমনী।

রিনামালা কিস্কু
বি এ (দ্বিতীয় বর্ষ), বাংলা (সাম্মানিক)

হারিয়ে যাওয়া গল্পগুলি

(১)

মাকে গত রবিবার বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসলাম। গেটটা বন্ধ করে শেষবারের মত তাকালাম পিছন ফিরে। জানলার ফাঁক দিয়ে মার বিষণ্ণ মুখে জোর করে আনা হাসিটা দেখে মুখটা ফিরিয়ে নিলাম।

গলার কাছে একটা কি যেন আটকাচ্ছিল। আর না দাঁড়িয়ে সোজা হাঁটা দিলাম। চৈত্রমাসের হাওয়ায় গৈরিক শূণ্যতা, ঘুঘুর ডাকটা আমায় বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল, বোধহয় কিছু ফেলে গেলাম।

প্রথম প্রথম মার ঘরটা, বেতের চেয়ার, ওষুধের গ্লাস আর কাননবালার রেকর্ডগুলো দেখে খারাপ লাগতো। সকালবেলায় ক্ষীণ কণ্ঠে সূর্যপ্রণামের মন্ত্রও শুনলাম না। কিন্তু আস্তে আস্তে এই সব অভাবই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। পরের দিকে মনে হতে লাগলো — ফ্ল্যাটটা কিন্তু তত ছোট নয়, যতটা ভাবতাম।

অনেকদিন পর রেডিওতে 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় ....' গানটা শুনে মনে পড়লো।

গাঁয়ের বাড়ীর দাওয়ায় বসে মা সলতে পাকাতে পাকাতে গাইছে, আর দূরে শুঁয়োপোকার মতো শহরের ট্রেনটা হুইসিল বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে।

(২)

'যা যায় তা আর ফিরে আসে না কখনো,
ঠিক আগেকার মতো'

এখানে আমাদের কুয়োপাড় ছিলো। চৈত্রমাসে কুয়োর পাশের বাতাবিলেবু গাছটায় সাদা সাদা ফুল ফুটতো। ফুলটার অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ। চোখ বন্ধ করলে এখনো যেন গন্ধটা মনে হয় ধরা দেয়, আবার মিলিয়ে যায়, আর অদ্ভুত ব্যাপার!

ফুলে ভরা বাতাবির গাছ মনে পড়লেই ছবির রিলের মতো আরো অনেক ছবি পরপর ভেসে আসে, বড় হয় আবার হারিয়ে যায়।

মেঘলা আকাশ, হীরামনকাকার মটর ভাজার কালো কড়াই আর পলেস্তারা ওঠা মাটির দেওয়াল, অদ্ভুত ধূসর গন্ধওলা শাঁখ বাজানো সন্ধ্যে, লাল শালু দিয়ে ঢাকা কুলপি মালাই নিয়ে যাওয়া লোকটা আর লালচে আকাশে এক ঝাঁক টিয়ার বাড়ি ফেরা। কোনও ছবির সাথে কোনওটার মিল নেই। কিন্তু কেন ওরা সবাই একসাথেই ধরা দেয়। কোনটা রঙিন, কোনোটা সাদা-কালো।

আমার বন্ধু আনারুল ছিলো আমার ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গী। ও ভালো মাঞ্জা লাগাতে পারতো। মনে আছে, কি করে যেন একবার আনারুলের একটা ঘুড়ি নদীতে পড়ে গিয়েছিলো। পাহাড়ী নদীর ঘোলাজলের ঘুর্ণিতে ঘুড়ির পাক খাওয়া দেখতে দেখতে আমরা ঘুড়ি হারানোর বেদনায় যারপরনাই বিহ্বল হয়ে উঠেছিলাম। এখনো তিস্তার ধারে গেলেই ঐ হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা মনে আসে — মায়া হয়, ভালো লাগে।

এখন কতো জিনিস, কত অনুভূতি কত সহজে হারিয়ে যায়, বুঝতেই পারিনা। সেই অমল দুঃখগুলোও কবেই নিরুদ্দেশ।

এখন আর সেই কুয়োপাড়ও নেই, বাতাবির গাছ নেই। তার জায়গায় এক বহুজাতিক সংস্থার অফিস। আনারুলের সেই মাধবীলতার ঝাড় কিংবা শ্যাওলা ধরা লিলিফুলের বাগানও লুপ্ত। সেখানে বড়ো মাড়োয়ারী মিষ্টির দোকান।

সেই জায়গায় মলাট দেওয়া জলছবির খাতা আঁকড়ে ধরে একলা বিকেলে কেঁদে যায় শৈশব।

(৩)

কিছু ঘটনার তাৎপর্য তখনই বোঝা যায় না। পরে সেটা মনে করলেই তার অর্থ বোঝা যায়। তার সম্পর্কে জড়িত বহু তুচ্ছ ঘটনাও আলাদা মাত্রা পায়। দিনটা ছিল শুক্রবার। আজান শেষ হয়ে গেছে। আমি খেলার মাঠ থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরছি। দেখি দরজার পাশে মা দাঁড়িয়ে আছে। দুচোখ একটা মানুষের জন্য অপেক্ষারত। সে মানুষটা আর ফিরেও এলোনা। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন কলের ডিউটি শিফটের সাইরেনটা বাজলেই আনমনা হয়ে যেতেন। বোধহয় শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন মানুষটার জন্য, বাইরের দরজার সামনে গলা খাকরানির আওয়াজ শোনার জন্য।

(৪)

সূর্য তখন ঢলে পড়েছে বড় জোরার মাঠের প্রান্তে।

হেডমাস্টার প্রসন্নবাবুর বাইফোকালের ফ্রেম শেষ বিকেলের আলোয় কারুকৃত। অমল মাথা নীচু করে স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে। এ বছরের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। স্কুল ফাইনাল পাশ করে শহরের কলেজে যাচ্ছে।

অমলের বাবা একটা মুদি দোকানের কর্মচারী। প্রচণ্ড অভাবে থেকেও লড়ে গিয়েছে ছেলেটা। মনের ভেতরে যে এত জোর কে বলবে বিনীত, শান্ত, লাজুক ছেলেটাকে দেখে। শেষবারের মত প্রণাম করলো স্যারকে। প্রসন্নবাবু, মাথায় হাত রেখে বললেন 'মানুষ হও। এই তোমার একা চলা শুরু হলো। সততাকে হারিয়ে ফেলো না।' স্যারের চোখ ছলছল করছে। অমল ধীরে ধীরে আবছা হয়ে যেতে থাকলো।

পথের দুপাশে অমলতাস গাছের সারি। অমলের বিন্দু হয়ে যাওয়া পর্যন্ত স্যার তাকিয়ে থাকলেন। ঝাপসা চশমাটা খুলে মুছে নিলেন দুর্বলতা। অমলের কানে তখনও বাজছে স্যারের সেই গম্ভীর গলার স্বর। পাহাড় যদি কথা বলতো তবে বোধহয় এমনই শোনাতো —

'আমরা যারা বেসেছিলাম দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো, ...
আমরা দেখেছি যারা
শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ।'

এসবই চলে যাওয়া। এক্কেটা একেক রকম। সময় কখনো দুটো গভীর সম্পর্কের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে, একে অপরকে তবুও দেখতে চায়। ইচ্ছে না থাকলেও কাউকে চলে যেতে হয়। কথা দিয়ে, কথা না রেখে। চলে যেতে হয় পুরনো ঘর, পুরনো রাস্তা, পুরনো গন্ধ, পুরনো শব্দকে কিংবা ফিরে আসে নতুন রং নিয়ে। কিন্তু সব চলে যাওয়ার পেছনেই থাকে ভেজা বিষন্নতা।

বিষন্নতাও কখনো কখনো সকালের মত স্বচ্ছ, কখনো দুপুরের মত নীরব, কখনো গোধূলির মত লালচে ধূসর।

পৌলমী চ্যাটার্জী (অর্থনীতি, দ্বিতীয় বর্ষ)

এতটুকু বাসা

পশ্চিমের সূর্য তখন অস্তগামী। গোধূলির শুভক্ষণে পাখি ফিরে আসছে তার বাসায়। প্রকৃতির এই সুন্দর পরিবেশে কলকাতার রাস্তায় দেখা গেল কয়েকটি অর্ধনগ্ন শিশুকে হিসাব করতে তাদের সারাদিনের রোজগার। ওরা ভিক্ষা করে। আশালতা তখন তার সারাদিনের রোজগার নিয়ে ফিরছে বাসায়। আশাও ভিক্ষা করে। দুমুঠো চাল বসিয়েছে সে হাঁড়িতে। উনুনের জ্বাল তখন দেওয়া হচ্ছে কুড়োনো কাগজ আর কুড়োনো পাতা দিয়ে। আশার মন জুড়ে এক ধূধূ হাহাকার। কালকেই ভেঙ্গে যাবে এই ছোট্ট এতটুকু বাসা। বাড়িগুলো সব বেআইনি। তাই কলকাতার কর্পোরেশন ভেঙে দেবে এই ঝুপড়ি। ভেঙে যাবে আশার চিরন্তনী আশা নিয়ে থাকা এই প্লাস্টিক, বেড়া আর অর্দ্ধ ছেঁড়া কাপড়ের ঝুপড়ি বাড়ি। পাশের জম্মু অবশ্য বলেছিল আশাকে তার সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা। আশা বুঝেছিল জম্মুর আন্তরিকতা ছিল না, ছিল আশার দেহ যৌবনের প্রতি লালসা। আশার হাঁড়ির ভাত এখনো হয়নি। আশার সামনে দিয়ে ছেড়ে চলে যাচ্ছে একে একে ঝুপড়ি বাড়ি। আশার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে লক্ষ্মীর মা, রেখাদিদি, মহেনদাদা। আশারও মন চেয়েছিল চলে যেতে। কিন্তু হরিপদর স্মৃতি তাকে আটকে রেখেছে এই এক টুকরো বাসায়।

লক্ষ্মীর মা এলো আশার সামনে। বাবুদের বাড়িতে ও কাজ করে।

— হ্যাঁ গা বউ, যাবা না।

— না। আশালতার তীক্ষ্ণ জবাব জানিয়ে দিল তার এই বাড়ি আর একটা দিনের জন্যও দৃঢ় না হলেও তার জবাব যেন টিকিয়ে রাখতে পারে এই বাসার দৃঢ়তা।

— ওতো স্মৃতি আটকে রাইখ্যা কি কালকের পুলিশগো আটকাইতে পারবা। ওরা তো ভেঙ্গে দেবে।

— কেন ভাঙ্গবে? উরা এই ঘর তৈরী করেছিল? আমার হরিপদ করেছিল।

লক্ষ্মীর মায়ের চোখের জল তখন গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

আশার ভাতের ফ্যান পুড়ছে। আশা তার ভাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

— দ্যাখো কি করবে। এই জবাব দিয়ে লক্ষ্মীর মা ধীরে ধীরে পদচালনা করলেন। এক নতুন স্বপ্নের সন্ধানে এক নতুন ঘরের সন্ধানে।

আজ বারে বারে মনে পড়ছে আশার হরিপদর কথা। হরিপদ তার স্বামী। বাঁশদ্রোণী এলাকায় রিক্সা চালাত। মনে পড়ে আশার, হরিপদ তাকে ভালবাসতো। তারপর হরিপদ তাকে বিয়ে করে। আর এই ঝুপড়িতে হরিপদ নিজে তৈরী করেছিল এই ঘর। কি শরীর ছিল হরিপদর, বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ। কোঁকড়া চুল। আজও মনে পড়ে। আমাকে প্রচন্ড ভালবাসতো হরিপদ। পূজোতে মনিবের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিন্তু কিনে দিত নতুন শাড়ি। এত ভালবাসা আছে তার এই ঘরে। তবে সে কেন ছাড়বে এই বাসা। দুটো বাচ্চা বিইয়েছিল এই ঘরেই। তারপর হরিপদর সেই অ্যাক্সিডেন্ট। সমস্ত ঝুপড়ি নিস্তব্ধ করে চলে গিয়েছিল হরিপদ মৃত্যুর কোলে। কলকাতার চলন্ত বাসের সারথী তার জীবন ছিনিয়ে নিয়েছিল। উফ্ ....।

ছেলে দুটো আজ ভিক্ষা পায়নি। দুমুঠো ভাত দিয়ে আশা বসল। তার মন জুড়ে আজ একটাই প্রশ্ন কেন ছাড়তে হবে হরিপদর তৈরী এই এতটুকু ভালবাসার বাসা? পূর্ণিমার চাঁদ তখন মেঘের আড়ালে।

— মা কাল সকালে আমরা কোথায় যাব?

— কেন এখানেই থাকব।

হরিপদ, হরিপদ, হরিপদ। আজ শুধু মন জুড়ে হরিপদ। সুঠাম দেহ কোঁকড়া চুল। আমার হরিপদ।

প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে শুরু হল না আশার ভোর। ভীতি, ভালবাসা সবকিছু - সবকিছু আজ আশার মন জুড়ে। একে একে আসতে লাগলো পুলিশের গাড়ী। আসতে লাগল বুলডোজার। সমস্ত ঝুপড়ির আজ অন্য চেহারা। জম্মুও এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। আশা ঘৃণায় ভেঙ্গে পড়ল। তার মুখের ভাব যেন জানিয়ে দিল "এ ঘর ছাড়ব না"। ছেলেদুটো শুধুই কাঁদছে। ভাঙা শুরু হয়ে গেছে ঝুপড়ির। আকাশে তখন ঘন কালো মেঘ। ভেঙে গেল জম্মুর বাড়ি। ভেঙে গেল মহিমের বাড়ি। ভেঙে গেল পার্টি অফিস। সব বেআইনি। বুলেডোজার এগিয়ে আসছে তার ঘরের দিকেও। আমার হরিপদর বাসা। বুলডোজার থেকে নেমে এল এক লোক।

— আমরা তোমার ঘর ভাঙব। ঘরে কিছু থাকলে বের করে নাও।

বিহ্বল হয়ে গেছে আশালতা। সেই সুঠাম চেহারা, কোঁকড়া চুল। হুবহু একরকম দেখতে "হরিপদ"। না এ আশার হরিপদ নয়। আশার হরিপদ তৈরী করেছিল এই এতটুকু বাসা। আর এই হরিপদ তো ভাঙতে চায় এই বাসা। তার হরিপদ তো ছিল সৃষ্টির মূর্তি আর এতো ধ্বংসের।

আশার ঘর ভাঙা শুরু হল। মেঘের গর্জনে হারিয়ে গেল ঘর ভাঙার শব্দ। আশালতা বিমূঢ়, হতচেতন। ছেলেদুটো আশাকে জড়িয়ে কাঁদছে। আশা তাকিয়ে আছে ধ্বংসের হরিপদর দিকে। চলে গেলো হরিপদ তার সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত হিসাব চুকিয়ে। আশার আজ ভীষণ হালকা লাগছে। প্রকৃতির বুকে কালো মেঘ থেকে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। আশার চোখ থেকেও অঝোর অশ্রু।

অমিত চৌধুরী (প্রথম বর্ষ, বাংলা অনার্স)

স্বপ্নভূমি

সেদিন কদমগাছটা আকাশের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলেছিল। অনেক রাতে সব্বাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন। ছোট্ট বুবুও শুনেছিল ওদের কথা। ওর চোখে ঘুম ছিল না। জানালার এগোনো পাটাতনে বসে নিঝুম রাতে অবাক হয়ে শুনেছিল ওদের আলাপ। দূরের আকাশের তারাগুলো সবাই ওর বন্ধু। বুবু যখন ছাদে বসে আপন মনে গান গায়, আর হাওয়ার তালে ছাদের প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ছুটে যায়, ওর ছোট্ট ছোট্ট হাতগুলো দিয়ে হাতের মুঠোয় ধরতে চায় আকাশটাকে দূরের তারারা হাসে। বলে "বুবু তুমি বড্ড বোকা"। তাই আজ যখন কদম গাছ আকাশের সঙ্গে কথা বলছিল, বুবু খুঁজছিল তার প্রশ্নের উত্তরটা। একটা হাল্কা হাওয়া বইছে। একটু শীত হলেও কেমন যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে ওকে। হাসছে বুবু। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাকের মাঝে হঠাৎ ও আবিষ্কার করে ওদের কথা। গাছটা তার পাতার দোলায় কি যেন বলে আকাশকে। আকাশ তার জ্যোৎস্না আলোয় ছড়িয়ে দেয় হাসি। আকাশের কত রঙ। কত রূপ। আকাশতো বহুরূপী। সে কত রকমের সাজে। যখন ইচ্ছা যেমন। বুবুর খুব ইচ্ছা হয় আকাশের দেশে যেতে কিম্বা কদম-এর সাথে বন্ধুত্ব করে, জানতে ওদের নিরবতার ভাষাটা।

এখন বুবু একটু বড় হয়েছে। তারাদের হাসিতে ও আর রাগ করে না। কিছু কিছু সময় পাখিদের সঙ্গেও কথা বলে। ওদের ভাষাও বোঝে —

যখন রিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়ে
আর বাঁশের বনে পাতা নড়ে।

একটা নতুন ছন্দ খুঁজে পায় সে। আচ্ছা বৃষ্টি কি আকাশের কান্না? তবে যদি কান্নাই হয় ওর ছন্দটা এত মধুর কেন? কান্নাও কি এমন সুন্দর হতে পারে? দীঘির জলের টল্‌টলে চাঁদটা কেমন যেন একটা অদ্ভুত। যেন আকাশের আয়না। কাল রাতে, অনেক রাতে সেই আয়না কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল যে। কাছে গিয়ে দেখলো সেই জলের চাঁদের মাঝের একটা দরজা আছে। সেখানেই তো ওর দেখা হল আকাশ পরীর সঙ্গে।

সে তখন খুব খুশি। কত প্রশ্ন আছে তার আজ সে সব জানবে। আকাশ পরী বুবুর কাছে এসে বসলো। তাঁর তারায় জড়ানো গহনায় সাজানো শরীরে চাঁদের মত জ্যোতি। কিন্তু চোখে এক বেদনাময় ছায়া। বুবু জিজ্ঞাসা করলো 'আচ্ছা আকাশপরী সত্যি করে বল, তুমি কোথায় থাকো?" পরী বুবুর চোখের উপর হাত বুলিয়ে বলল এইখানে। ছোট্ট বুবু না বুঝেই হাসলো খিলখিলিয়ে। তার পরে একে একে শুনলো তারাদের অচিনপুরের কথা। কত গল্প কত চিত্তা। বুবু জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা আকাশপরী তোমার তো কত রূপ। তুমি তোমার ইচ্ছা মতন সাজো। তবুও তোমার কোন সাজটা সবচেয়ে বুঝি ভালো লাগে?" আকাশপরী হেসে বলল 'বৃষ্টি'। "তবে গুমোট হয়ে মেঘে ঢেকে রাখো কেন?" পরী বললে অভিমান। বুবু বুঝলো না। "কেন? কিসের অভিমান? আচ্ছা। বৃষ্টি মানে তো চোখের জল। তবুও তোমার ওই সাজটাই ভালোলাগে কেন?" পরী বললে মাটির ওপর অভিমান। তবে বৃষ্টির রূপেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। আকাশপরী বলে "আমি মাটিকে বড় ভালোবাসি। কিন্তু ছুঁতে পারি না। ওই কদমগাছই তো আমাকে ডাকে। রাতের বেলায় চুপি চুপি। তাই মাটির যখন কষ্ট হয় আমি কাঁদি।" বুবু বলে "তবে বৃষ্টির মাঝে অমন ছন্দ আছে কেন? কেউ কি ছন্দে ছন্দে কাঁদে?" পরী বলে ও ভালোবাসার ছন্দ। বুবু বলে "আচ্ছা আমিও তো মাটিতে থাকি, তোমায় ভালোও বাসি। তোমাকে ছুঁতে চাই। তুমি আমায় ধরা দেবে না?" আকাশ পরী বুবুর হাত মুঠ করে বলে — 'এখানে একটা উপহার দিলাম। পরে দেখে নিও।' বুবু বলে 'এর নাম কি?' পরী তার চোখ দুটো স্পর্শ করে বলে "ভালোবাসার স্বপ্ন। এই আমি তোমার হাতে আছি, আবার নেই।" এরপর কখন সকাল হয়ে গেছে। আকাশের ঠোঁটে ফুটেছে উষার হাসি। পরীও কখন চলে গেছে। বুবু চোখ মেলে। দেখে তার হাতের মুঠোয় আছে দুফোঁটা চোখের জল। এ কার পরীর, না বুবুর?

ধৃতিকল্পা দাশ
ইতিহাস (সাম্মানিক), প্রথম বর্ষ

CROSSING BORDERS

I have known roots
Growing deep into my 'soil'
I have known alien ones, too
Neither deep nor shallow
I have known sop seeping into my sense
So have I known sop throbbing beneath
A dry topagrophy
I have known lands in dreams too
visited by solitary feet
Waterfalls plunging into beds of silence
Frothing water into little lilies.
I have dug out yearnings too
Splitting like malnourished roots
Leaving a tender deep chasm
on seed's tiny heart
I have grown old with a land
I had mistaken to be mine
I have grown into a desert
With sands not of mine

—Sibendu Chakraborty
Ex-student, English Dept.

"COME TO AN END"

There's no end to it,
So who's to say the last word?
What came as a blow
Will later glow as a fire.
when clouds have had their shows,
rain will pour,
when snow has piled,
it will melt into a river.

What comes to an end
ends only to the eyes;
walks through the door of darkness into light.
Bursting the heart of the old,
the new will of itself unfold
when life's flowering's over,
Death's fruits will appear.

—Somnath Rai
B. Sc., 1st Year

FRIENDSHIP

Life is like a garden
And friendship a flower,
That blooms and grows
In beauty with the sunshine and the shower

Lovely are the blossoms
That are tended with great care,
By those who work unselfishly
To make the place more fair.

And like the garden blossoms,
Friendship's flower grows more sweet
When watched and tended carefully,
By those We know and meet.

—Sunil Kr. Mishra
B.Sc. Ist Year

YOU, ME AND MARQUEZ

Since its sunday and it has stopped raining,
I think I'll take a bouquet of flowers to my grave.
Red and white roses...
The kind you grow to decorate altars and Wreaths.
My dwelling is a bare, treeless place, swept
Only by the providential crumbs that return
After the wind has passed.
And she, lies prostrate, before her saints
Abstracted in making love in her dark little jacket and the
pink stockings
Lowering her head in the same way she had once said :
"Now that they have put in the toothpick,
your eyes are open and hard."
She will not notice...
That somebody has been disarranging these roses;
And I,
should he able to reach my grave :
Mingled now and dispersed forever;
among snails and roots.

—Rajeev Bhattacharjee
Ex-student, Dept. of English.

TEACH THE WORLD TO SMILE

Teach the world to smile,
Learn to love every one,
But do remember the work to be done.
Love and protect Nature,
For the survival of all creatures.
Make their future as bright as the sun
If others are happy, you would be in fun
The bird of peace is known as Dove—
Fill your hearts with love
Teach your heart to be out of greed
Teach the world to be freed.

—Pritam Chatterjee
2nd Year, English (Hons)

SOMEONE MADE ME BELIEVE...

It was a still dark night
When someone made me believe
 I could fly...!
And me...,
Stepped out and stretched my wings
To fetch the light!
When the world below
Slumbers relaxed and sleeps in peace
I fly and fly...
Over dizzy heights and perilous seas;
To nourish the dreams I breed,
 I choke, I bleed.
Like the phoenix
I may be burnt...,
My wings may be scorched
And my ribs may be smashed,
Perhaps this maiden flight,
May be, the very last one....
But I have chosen
 To reach the sun!
When my feathers are torn.
A thousand fleecy clouds will be born
To quench the thirsty lands;
My blood will make the roses bloom
 Over arid desert sands.
At last...,
All the doors will be shut for me
The Earth will refuse
To bear my grave.
Banished from this treacherous world
 The only reward I crave.
But to redeem a promise untold
To repay the moments I stole
I shall come back, with my spirit
sealed within your soul!

—Swagata Nandi
Ist Year, English Hons.

HAI KOI JAWAAB?

- If it's Zero degrees outside today, and it is supposed to be twice as cold tomorrow, how cold is it going to be?
- Why is it called building when it is already built?
- If pro is the opposite of con, is progress the opposite of Congress?
- If all the world is a stage, where are the audience sitting?
- If horrific means to make horrible, does terrific mean to make terrible?
- Why isn't 11 pronounced onety-one?
- Do lipton Tea employees take Coffee-breaks?

—Pritam Chatterjee
IInd Year, English (Hons.)

Granny's Diary

It was yet another day in an eighty year old woman's life. But that one day was something different to her. Why was that day different? Why was there a glow in her pale skin? Why was there a twinkle in her aged eyes? Why was she an ancient woman, so excited that day? Nobody knew, nobody cared to know. They were all too busy with their lives. Rajni— our ancient woman had a grand daughter, Suman who went to college, who was so busy that she could not even describe her first day there to her Granny. 'I went to college and had fun' was all she could say.

'Nobody has time for me these days', granny used to say. She had a diary— her sole companion. It had been with her for the past seventy years. It had seen her grow up and then grow old. It had stored all her thoughts— nobody cared about it either. 'Who would want to know what granny thought years back?', Suman said.

With shaky hands Granny flipped the yellow pages of her diary, and on a certain page she stopped. There was an eagerness in her eyes as she read the contents— the eagerness was slowly replaced by nostalgia. Granny looked up and beared back on her easy chair— her eyes were watery, she hugged her diary and then resumed reading. A faint smile lingered on her dry lips, a tear rolled down her eyes and somehow blotched a certain word in her diary— she signed and said, 'Perhaps, at last, it is time? What had made her say that? What had made her happy and sad?— nobody knew, nobody cared to know.

It was getting dark— it was an ordinary January evening, special to Granny in some strange, ancient way. Suman came in saying, 'Granny, you would not believe what happened today!' Granny did not say her usual 'What, honey?', but Suman went on saying her unbelieveable story. After a while she realised that her Granny was unusually quiet— as if she was not there. 'Granny, are you all right?', Suman asked. The truth dawned on her slowly— The truth dawned on her slowly— the truth that had made the doctor say, 'Sorry' in a very business like way— the truth that had made him write a certificate— a death certificate.

The next day, a very morosed Suman entered Granny's empty room— the room that looked so barren without its ancient inhabitant. Suman's eyes fell on the table by the window, it had Granny's diary on it. Somehow, now the diary seemed to be the only thing close to Suman's heart. She took it in her hands and opened it along the pagemark. She read :

26th January 1941— At last I am eighteel Ma-Baba wished me and Dia screamed, 'Happy Birthday, Rajni' in my ears.

The word 'Rajni' was blotched. The tear that had rolled down Granny's eyes and had blotched her name, had made her say, 'Perhaps at last it is time. Suman came to her parents and whispered, 'Yesterday was Granny's birthday!'

—Swatilekha Bhattacharya
1st Year, Zoology (Hons.)

The White Packet

Friends, sometimes we get so busy with ourselves that we forget to think about others. By 'others', I am not referring to close relatives or friends. 'Others' means the other side of life, a life that is not lived with pleasure or hopes for a bright future. There are many people on this earth who live only in the present a bitter, unwanted present. These people do not recall their past not because they haven't been inspired by Wordsworth but because they find nothing interesting in their past that is worth recalling. These people do not build hopes for their future because they haven't been taught to dream. They are queer people., no doubt, and thinking about them is a waste of time.

•••

The big red clock in the drawing room showed eleven in the morning. Baba had just gone out to office and Ma was busy in the kitchen. Mala was standing in the verandah waiting for the kachrawallah. Now and then, she kept glancing at the big white packet that stood at the doorstep beside the usual, everyday dustbin. Earlier in the morning, Mala had been busy tidying her study-table and bookshelf. She had put all her discarded things in the white packet and then carried it outside. Now she stood waiting for the packet to be taken away by the kachrawallah as though she felt that the ultimate tidiness of her table depended on the taking away of the packet.

The kachrawallah arrived at about fifteen minutes past eleven. But the cart was not being pulled by the sweeper, Ali, but by his son. This boy was about 10 years old and the cart seemed too heavy a thing to be pulled by him. He looked forlorn inside his faded green shirt. He was humming a popular Hindi hit as he threw the garbage in his cart. Just as we collect our shopping things at co-operative markets, this sweeper-boy was also collecting the rubbish in his cart!

Slowly, the boy came in front of Mala's house. He threw the contents of the dustbin into his cart and then picked up the whitepacket. He opened it and his eyes began to shine when he looked inside. There were so many wonderful things inside it! He pulled out a small, blue school bag. Mala used it when she was in junior school. The bag was not torn, the zips were all right. It matched with boy's shirt and his future and somehow he liked it very much. He only the colour was faded and a thick layer of dust lay on it searched its pockets and found a 'mango-bite'. Mala had never bothered to eat it, as she did not like the flavour. Moreover, it was given by someone whom she did not like very much. But the kachra-boy liked it and popped it into his mouth— delicious! From another pocket, he found a flattened tube of 'vaseline lip-guard'. It was an old tube and Mala discarded it because it was only two months away from the expiry date. Moreover, she now uses the dashing strawberry scented 'lakeme lip-gel'. But this boy smelled the tube and then kept it in his front pocket. Next he drew out a paper-mask of Donald duck. The boy tried to wear it— he was so delighted that he laughted to himself. He found coloured bits of paper, coloured beads, an old rakhi and a small, woolen doll with one eye and one leg. He kept all these in the bag. He shook the white packet and more coloured papers came out. Old zari strings and a small torn comic book also fell out. The boy flicked through the pages of the comic and liked the colourful pictures.

Then came out a pen whose one end looked colourless and shapeless from biting. The cap was missing, but a deep blue colour came out of it when the boy drew lines on the papers. It seemed like magic and he regarded this as his best find. He chuckled to himself as he drew more lines. He packed all these treasures in the blue bag and took it on his back. He seemed very happy with his treasure hunt for he began to sing his song more loudly as he pushed the cart forward. Mala had watched all this with a strange expression on his face—"queer boy", she thought.

•••

After that day, whenever Mala cleaned her table, she was careful in leaving a little cream in her discarded 'lip-gel' tube, a little perfume in her 'to-be-thrown-away' spinz bottle, a little bit of her favourite chocolate and a little more coloured papers which she no longer needed. Each time she also threw away an old pen with a missing cap but a little bit ink left inside. She also remembered to tie the mouth of the white packet with a little zari string.

—Pritha Chattopadhyay
1st Year, Communicative English

USE YOUR MIND

1. Which dog has no tail?
2. Which is the easiest way to double the money?
3. Which is the sweetest tree?
4. Some months have 31 days, some have 30 days. How many of them has 28 days?
5. Which bank has no money?
6. On Which form, one can sit and stand?
7. On which bed, you can't sleep?
8. Name the ball which can write?
9. Which is the most dangerous city?
10. Why do we drink water?

Answer :
1. Hot dog, 2. Fold it, 3. Pastry, 4. All months, 5. River bank, 6. Platform, 7. Sea-bed, 8. Ball-pen, 9. Electricity, 10. Because we can't eat it

The Miracle Cure

When 8 years old Neelu heard her parents talking about her little brother, Romi, she realised that he was very sick and they did not have enough money for his treatment. Neelu heard that his Papa saying, "only a Miracle can save him now".

Neelu went into the bedroom and tookput a jar from its hiding place; there were some coins in it. She made her way to Drug store but the Pharmacist was too busy to pay her any attention.

Then after sometime he asked, "what do you want"? "My brother is very sick, his name is Romi and he has something bad growing inside his head and my Papa says only a Miracle can save him now. So, how much does a miracle cost"?

The Pharmacist's brother, a well-dressed Man, stepped down and asked the little girl, "What kind of Miracle does your brother need"? "Don'tKnow", Neelu replied, "I just know he's really sick and Mummy says he needs an operation. But my Papa can't pay for it, so, I want to use my Money". "How much do you have"? asked the man. "Twenty one rupees and seventy five paise", Neelu answered "Well, What a coincident", smiled the man, "the exact price of a Miracle for your brother". He took her money in one hand and he grasped Neelu's hand, saying take me to your home. I want to see your brother and meet your Parents. "Let's see if, I have the kind of Miracle you need".

That well dressed man was non-other than a neuro surgeon. The operation was completed without any charge and it wasn't long until Romi was home again. "I wonder how much the surgery cost"? thought her mother, aloud.

Neelu smiled to herself. She knew exactly how much a Miracle cost. Twenty one rupees and seventy-five paise... plus the trust of a little child.

—**Samiuzzama Siddique**
1st Year, B. Sc.

DISCIPLINE

Everyone agrees on the importance of discipline in one's life. It should dominate 100% of our activities. Did you know that the word itself totals 100? You'll ask how ? Here's the answer. Take the number value of each alphabet.
D=4, I=9, S=19, C=3, I=9, P=16, L=12, I=9, N=14, E=5
Total=100
Thus, discipline is undoubtedly 100%.

—Pooja Saha
B.Sc. (1st Yr.)

Shadow Of God

This is an inspiring real life tale of a legend who looms larger than life in the mind of every soccer fanatic, young and old alike.

A boy was born on 30th Oct. 1960 in Lanus, a shanty town in Buenos Aires Province, Argentina. Argentina then was in its early years of economic, political and social crises which have since worsened. The boy had no teddy bears or modern electronic games in his humble hut except a leather ball, which his uncle Cirilo gave to him. During the day he'd kick it about in the waste ground around his home and learned his first tricks, gradually turning his toy into a source of skill and inspiration unlike other young boys in his neighbourhood, he was never into crime to make quick money, thanks to his parents who believed you might avoid taxes but should never rob your neighbour. The boy's in-born talent was spotted in his teenage by a scout and his parents let him abandon school and join the local football club to fully exploit and harness his talent. The boy soon rose to prominence through his endearing & towering success in the national and international arena. He became the national icon and a universally adored figure. The Argentines made him into on icon just as the Americans made an icon of Elvis Presly— an integral part of a nation's culture. Such was his charisma and achievement that his fellow countrymen believed that his success and glory made up for their faliure as a nation. —By now all you readers must have understood who I am talking about, yes he is the one and only Diego Armando Maradona— The Golden Boy as German Great Beckenbauer affectionately christened him.

During a tempestuous career spanning two decades he played for top clubs in South America and Europe and was the cynosure of all eyes in the four world cups he played.

Who says football is for tall guys? Maradona at 5 feet 4 inches and Stout figure with the will strength and great balance never succumbed to the extraordinary catalogue of physical abuse from aggressive opponents. Moreover, what is great about Maradona is, he combined the skills and vision of the Brazilian Great Pele with the versatility of the Dutch star Johan Cruyff. There was a purity in Maradona's game and everyone called it poetry.

Winning the Mexico World Cup in 1986 was his landmark achievement. That world cup presented the soccer world with Maradona's poetry— a game of his very own, marked with extraordinary dribbling skills, accurate passing depth of vision, sharp reflex and flair. The whole world was enthralled by his music interwoven with magical and breath taking spells.

His second goal against England after collecting the ball inside his own half and then dribbling past six English players is till date the best goal in the history of the game.

His football career was marked with scandals and controversies as well. He fell prey to narcotics, took drugs to enhance his performance and the aftermath is known to everybody. It sadly marked the premature end of his career. His rags-to-riches career seems to be a fairy-tale.

Maradona deservedly won the best player of the 20th century through worldwide opinion poll on the internet conducted by Fifa. Pele too, was given the same award by the Fifa (which is known to have a soft-corner for the Brazilian Great) for his life-time achievement and popularising the game across the world.

No doubt when Maradona dies, no matter how he dies, his funeral will be as big as that of Eva Peron erstwhile the charismatic wife of the President, Juan D. Peron, who was adored by the poor and dispossessed.

Truly Maradona is the unparalleled and flawed genius, the world has ever seen.

—**Prasanna Kumar Das**
3rd Year, B. Sc.

"ADDA"

Although the word "ADDA" is well-known to us, we can't define it precisely. However, we can't deny the fact that we, Bengalees are very fond of "ADDA".

This single world can differentiate the people of Bengal from the rest of the world. "ADDA" is not simple conversation, or discussion, or debate, or gossip, but its a mixure of all these. The subjects are also very interesting. It may be a film, a philosophical point, the fall out of 'privatisation', of leftist political activities or even Tintin. The more notable thing is that when we start "ADDA", no particular subject is selected beforehand. It's better to say that whenever we select a topic for "ADDA", it no longer remains an "ADDA". This is because "ADDA" refuses to be formal and systematic.

The origin of "ADDA" possibly lies in the village life of the older days; in the 'chandimandap', for instance. Most of the time however, their discussions were very selected and limited. In the past, "ADDA" was meant for the men excelusively; but the women-folk too were specialised in it. Therefore, now-a-days, life without "ADDA" seems absurd.

There are some common places that are famous for "ADDA". Such as the canteens of the colleges, parks, clubs and of course the coffee-houses. However, "ADDA" doesn't need any particular place, or time or age bar. "ADDA" grows whenever some students, or a band of unemployed youths, or some pensioners sit together in a lawn, in a park, or in the canteen. Even if the students grow up, or some of the unemployed people get employed, the "ADDA" doesn't cease. It continues with newer entrants. "ADDA" is in our blood. It's deeply rooted in our culture. Some say, that "ADDA" is harmful, as it makes people idle. To some extent it's true. Students sometimes miss their classes intentionally due to "ADDA" which is not desirable. Sometimes, my mother burns milk in kitchen, unmindfully because of "ADDA". But I think, if one is cautious and consicious, the harms can be avoided; however in "ADDA" it's very difficult to be cautious and conscious. But one should not get rid of "ADDA". I think, "ADDA" is very essential in order to make our lives happier, as it provides much needed diversion too.

"ADDA" survives because it is disorganised and devoid of hard and fast rules. A man who is utterly a strict disciplinarian and perfectionist in his routined life, may behave just the opposite in an "ADDA". This nature of his, which is perfectly opposite to his routined nature, perfectly fits the soul of "ADDA". And thus, "ADDA" becomes a perfect culture, surpassing all culture barriers. And so, it has become so dear to us.

—Arunima Dasgupta
1st Year, Geography (Hons)

CARTOON QUIPS

(1) Wakened out of sleep, man answering phone "You have the wrong idiot, you number!"

(2) A minister of Bihar was the chief guest at the final of a football tournament. After giving away the prizes he was requested to say a few words. He said, "It pains me to learn that this year only two teams could make it to the finals. When we have hundreds of football clubs in the country, we should endeavour to see that more teams come to the final.

Terrorism in Kashmir

It has ben fifty six years since India has been independent. Fifty six years is the period of a problem, the problem concerning Kashmir. So, the issue which largely looms throughout our country, in every Indian's subconscious or conscious mind is only Kashmir. The valley of natural beauty, of uneartly serenity has been in the news and in the forefront of discussions for all the wrong reasons. Reasons, as you might ponder, are only of beastly violence, inhuman actions and disrespect for human life which I can simply describe as terrorism.

Terrorism— the word might sound very international to you, owing to the 9/11 attacks. But mind you, it has been so only recently; terrorism has become something national for more than fifty years in our very own Kashmir. Yes, terrorism has been the only dark cloud over Kashmir, affecting the lives of its people, its economy, its culture and heritage, its resources and all other vital aspects of it. Discussing about Kashmir and not mentioning the contribution of a particular nation towards it, is highly unlikely, more so when it is a fact of concern for the entire international fraternity. Pakistan, our neighbour, has purposely plagued Kashmir and our entire nation in a bid to reign supreme over the land. As a tool, it has used terrorism very strategically in various modes of cross-border terrorism, alias— "shadow war".

Pakistan, our righteous neighbour, since the odd fifty years, has been the home of heartless militant who were trained on its very soil in various militancy camps, strewn across the country and particularly close along the LOC. These militants or "mujahideens" or freedom fighters, as they would personally rather prefer, after completion of their courses in violence, are then infiltrated across the border into Indian lands to wreck havoc. What is surprising to acknowledge is that their actions and plans are not just limited to Kashmir alone. But recently it has spread to almost all parts of India and other nations too.

Previously, India was the only one truobled by these pests. But now the whole World has sat up and noticed them and their actions, thanks to the 9/11 attacks. Bombblasts, mass killings, etc. are now common incidents across the face of the earth. India now has a platform to base its allegations against terrorism and against Pakistan to the international community. Pakistan's irresponsible behaviour has only added to the number of innocent lives lost, which is no doubt a terrible and irrepairable loss for us, but has in no way deterred us. We have not been soft to Pakistan, the proof being the wars with the infamous nation in 1965 & 1971 and the Kargil War. But Pakistan is yet to learn its lesson. With constant infiltration, across the border, which are financed by Pakistan, things are becoming more and more complicated and dangerous in Kashmir." "The heaven on earth" is becoming more and more like a War stricken land. Toursim, once a flourishing business, which roped in a great deal of foreign currencies is, in the gutters now. Indians from other states do not gather up enough courage to visit Kashmir, so the question of foreign travellers is quite redundant. The plight of the Kashmiris, no douubt, is soaring high up day by day.

But still all is not lost. There is still a lot which we can hold to. Just as light is always sighted at the end of a dark tunnel, things seem to turn a shade lighter in Kashmir. With the onset of a new party at the head and a new Chief Minister— Mr. Mufti Mohammed Sayed, things are pledging to turn normal. Whatever the Kashmiris have been deprived of due to hard and difficult circumstances, are now being returned to them step by step. A big example could be the inauguration of cellular services in the state when STD and ISD calls were banned due to risk factors, for a long time. As things improve, we as Indians pledge not to succumb to threats and decide to use our national integrity against such misconceptions.

—Sreemoyee Mukherjee
2nd Year, Economic Honours

Globalization — For the Rich or Poor

Globalization is a process which vendors various activities and aspiration, worldwide scope or application. This process though not novel has caught the world in its grip. The technological progress in the 20th century has hastened the process of globalizatoin. The awesome speed of progress has dazzled the west to such an extent that they propagate globalization as the vehicle to achive nirvana.

To allow globalization to take its natural course, the west claims that the free trade is a necessity. The break down of trade barriers would allow healthy competition which in turn would help poor countries to combat poverty and inequality.

This logic seems to favour the rich intent on getting richer, as free trade does not allow infant industry protection allowing new industries to develop without facing foreign competition till they are big enough to compete on equal terms.

However if one looks back, Britain on its path to development did not believe in free made. During the industrial revolution (based on textile industries) government intervetion helped Britain to cut out its competitions. This was achived by heavy taxing or banning the import of foreign goods and banning the export of raw materials to other countries with competing industries in 1850 after achieving technological superiority did Britain open its markets?

America too believed in infant industry protection. In 1816 tax on imported goods was 35%-40% and 50%in 1832. Combined with the cost of transportation to America, the America manufacturers got great advantage in the domestic market. In the recent times due to high subsidy, the European and american agericultural products were made cheap artificially It is cheaper to produce sugar in Burkina Faso or kenya than it is in the US or Europe. The logic of globalization is that Us and Europe Would stop subsidising their sugar producers and bye the much cheaper commodity from the cheeapest producer of the world. Subsidies have impoverished sugercane growers in Kenya to such an extent that they have stopped producing suger. One World Bank calculation showed that Sub Saharan Africa, the poorest region in the World, saw its income decline by 2% as a result of so called free trade. According to Joseph Stiglitz trade liberalization for the product that they exported, but at the same time continued to protect those sectors in which competition from developing countries might have threatened their economies".

According to global trade rules theft of intellectual property rights is a crime. History has shown that Switzerland's industrialization took off in 1859, when a small company based in Basel stole the airline dying process which had been developed and patented in Britain two years back. The compant\y was later called Ciba. Recently though a series of mergers it became Novartis and there Syngerta. In the Netherlands in the 1890's Gavard Philips nicked Thomas Edison's design for incandesent lamps and went on to becoming Europes most successful electronics company.

Nowadays World Trade Organisation (WTO) has become a policing mechanism which ensures compliance and punishes these who violate intellectul property rights. The most recent example is regarding generic drugs essential for combating HIV/AIDS, tuberculosis and malaria. America enjoys patent over these drugs and produces them at a steep rate.

According to compassionate and commercial logic the countries namely India and Brazil which produces these drugs cheaper (than the US) should be the ones providing poorer nations such as South Africa with these drugs. 60% of South Africa population is HIV positive. So if cheaper drugs are available to them than a greater portion of the population could be helped. Unfortunately the ground reality is very different. The US refused to allow others from providing these drugs at a cheaper rate. Finally after complicated negociations by the US, Brazil, India, South Africa and Kenya, the WTO has managed to finalise an agreement to make life saving drugs available to poor countries facing health emergencies.

Globalization is meant to promote sustainable development, but what is noticed is that powerful countries intervene which they feel theatened. This sense of insecurity urges these countries to cut out competition ruthlessly and indirectly allows poverty and inequality to persist.

Development cannot take place for all countries by the same formula. Thus people all over the globe have to be committed to make globalization work not only for the industrial counrties but for the poor and the developing nations. Global institutions need to perhaps make painful changes if globalization with a human face has to succeed.

—Nayana Bose
2nd year, Economics (Hons)

AN INTERVIEW

Examiner : What is your name?
Examinee : S. N. Sir.
Examiner : What do you mean?
Examinee : Sunny Nandee Sir.
Examiner : What is your father's name?
Examinee : S. N. Sir.
Examiner : What do you mean.?
Examinee : Shiv Nandee Sir.
Examiner : What is your age?
Examinee : S. N. Sir.
Examiner : What do you mean?
Examinee : Seventeen years and Nine months Sir.

The next day the examinee went to the examiner's house and asked the examiner.

Examinee : What is my result Sir?
Examiner : S. N. Beta.
Examinee : What do you mean sir?
Examiner : Sorry No Beta.

—Avirup Rakshit
1st Year B.Sc.(Hons)

भाई-भाई

हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई,
'ई' की मात्रा सबमें समाई।
'ई' से बनती है इन्सानियत,
तुम भी ये जान लो मेरे भाई।
मालिक सबका एक है बन्धु,
उसने हो ये दुनिया बनाई।
दो आँखे, दो हाथ दिये सबको,
सूरत सबकी उसने एक बनाई।
गोरे काले का भेद है माना,
पर खून में लाली एक समाई।
उसने माँ-बाप, भाई-बहन बनाए,
जातों में दुनियां हमने बनाई।
एक सा सबका जन्म है होता,
मौत भी सबकी है होती आई।
'मेरी' बात सब मानो यारो,
बनके रहो सब भाई-भाई।

—Md. Shamshad Alam
3rd Year, B.Sc.

कभी तो सुबह आएगी

हृदय जब शून्य के सागर में
डूब पड़ता हो,
थाम लो डोर धड़कन की,
कर्मरत हो!
भूलो नहीं यह शून्यता,
फिर जोश से भर जाएगी,
कभी तो सुबह आएगी!
आज जीवन साँझ है,
दीपक टिमटिमाता है,
तम के अंधेरों में,
वही पथ भी दिखाता है,
निराश न हो!
एक रास्ता तय करने के बाद,
सचमुच!
फिर सुबह आएगी।

—Poulami Kar
1st Year, B.Sc.

हमारी चाहत

चाहा था, तुमको दिलो जान से ज्यादा माना था तुमको औरों से ज्यादा।
पूजते थे तुम्हें भगवान की तरह, मरते थे तुम पर दिवानों की तरह।।
हमने तो सिर्फ दिया था तुम्हें प्यार, बदले में मुहब्बत के सिर्फ मिला था हमें दर्द।
पर संगदिल सनम तुमने क्यों किया हमें रूसवा औरों के लिए।।
तुम्हारे यादों के सहारे जिन्दा रहेंगे, और खून के घूंट, जख्मों के पीते रहेंगे।
हम तुम्हें चाहते रहेंगे मरते दम तक,
तुम्हारा हम इंतजार करते रहेंगे कयामत तक।

—Soumani Banerjee
1st Year, B.Sc.

خودی کو کر بلند

SHAZIA MEHVISH
Bsc. 2nd year
Roll: 1110

اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل و برتر بنایا ہے اس نے آدم کے ذریعہ حوا کو پیدا کیا چنانچہ اس دنیا میں ایک مرد کے بعد عورت کو افضل درجہ حاصل ہے۔ وہ ایک بہت ہی اہم اور کارآمد پرزہ ہے اس کارخانہ الٰہی کا جس کے بغیر اس کارخانہ کی کارکردگی ممکن ہی نہیں۔ عورت کا سماج میں ایک خاص حصہ ہے۔ جس طرح ایک مرد کو فعال و متحرک، نیک و صالح، غیور و خوددار، دینی و دنیاوی علوم سے آشنا ہونا ضروری ہے عورت کا بھی ایسا ہی کامل ہونا لازمی ہے ورنہ اس کی گود میں پروان چڑھنے والا ''مستقبل'' روشن و تابناک ہونے کے بجائے تاریکیوں میں ڈوب سکتا ہے۔

آج کے پُر آشوب زمانہ میں جہاں ہر فرد (خصوصاً حساس و باشعور) ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہے۔ معاشی مسائل اگر اپنی سنگینیوں کے ساتھ سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ ایک عورت کو دوسروں (باپ، بھائی، شوہر، بیٹے) پر حد سے زیادہ انحصار کرنا کسی حد تک ان پر ظلم کرنا ہے اس لئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی قدر و قیمت کا احساس دلایا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کی چہار دیواری میں رہ کر خود کو بالکل محتاج بنا کر اس خیال پر صد فیصد مہر اثبات لگوا دی جائے کہ (عورت یا) لڑکی ایک بوجھ ہے۔ ایک جگالی کرتی ہوئی گائے کی طرح ہے جو ایک کھونٹے سے کھول کر دوسرے کھونٹے میں باندھ دی جاتی ہے اور خانہ داری کے معمولات میں اپنی زندگی گذار دیتی ہے اور اس پر دوسروں (مردوں) کا یہ احسان کہ وہ ان کی کفالت کرتے ہیں حالانکہ اس کفالت کے بدلہ یہ عورت ملازمہ، بنک، بچوں کی گورنس یا آیا، سکریٹری، چوکیدار، باورچی، دھوبی وغیرہ جیسی بے شمار خدمات انجام دیتی ہے۔ (ظاہر ہے یہی جاں فشانیاں اگر وہ دوسری جگہ کرے تو اس کی محبت و مشقت مالی منفعت بھی بخش سکتی ہیں)۔

یہ بات صحیح ہے کہ عورت ان کاموں کو انجام دینے کے لئے ہی بنائی گئی ہے لیکن یہ بات ٹھیک نہیں لگتی کہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھاتے نبھاتے اپنی شناخت کھو بیٹھے اور اس کی دیگر صلاحیتیں زنگ آلود ہو کر فنا ہو جائیں۔

حقیقت یہ بھی ہے کہ مردوں کی اس دنیا اور سماج میں عورت اتنی مجبور و بے بس ہوتی ہے کہ اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر، خود پر جبر کر کے وہ اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈھال لیتی ہے۔ ایک وجہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ یعنی رزق کا مسئلہ اور یہ رزق کا مسئلہ مرد کے ذریعہ حل ہوتا ہے اگر سوچا جائے تو یہ بات کتنی عجیب سی لگتی ہے کہ صرف رزق کے حصول کے سبب وہ اپنی بلند پروازیوں کو تیاگ دے۔ اللہ نے اسے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کو بروئے کار نہ لانا کفرانِ نعمت کے مترادف بھی ہے۔ اس لئے اپنی شناخت بنانا اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا اس کے لیے لازمی بن جاتا ہے۔ جو قوم و انسان کی ترقی کی ضامن ہے۔

آج کا زمانہ اس نقطۂ نظر سے کچھ کچھ تشفی بخش ہے کہ آج ہر میدان میں عورت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حصول علم و اعلیٰ تعلیم کے لئے وہ صرف اپنے والدین کے ہی گھر سے نہیں بلکہ سسرال سے بھی آرہی ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے بچوں (نیز نوزائیدہ بچوں) کو ساس نندوں کی تحویل میں دے کر وہ درس گاہوں کے تقاضے پورے کر رہی ہیں۔ اور بخیر و خوبی اپنی ملازمتوں کی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہیں۔ ان کی ان کاوشوں میں ان سے متعلق مرد (باپ بھائی شوہر دیور وغیرہ) بھی تعاون کر رہے ہیں لیکن ایسی مثالیں کم ہیں۔ اگر کم ہیں تو کم ہی سہی۔ آج اتنی ہیں لیکن امید ہے کل تعداد اور بڑھے گی۔

غزل

وہ صلہ ملا ہے مجھ کو تری دوستی کے پیچھے
کہ ہزاروں غم لگے ہیں مری زندگی کے پیچھے

نہ تو دل کا کوئی مقصد نہ تو تیری کوئی منزل
میں چلا ہوں کیوں نہ جانے کسی اجنبی کے پیچھے

تجھے غیر کی تمنا، مجھے تیری آرزو ہے
میں تو بن گیا تماشا تری دلگی کے پیچھے

یہ جو تشنہ لب اٹھے ہیں تری انجمن میں ساقی
کہیں زہر پی نہ جائیں تری بے رخی کے پیچھے

چلا جب مرا جنازہ لب بام سے وہ بولے
یہ برأت کس کی نکلی مری زندگی کے پیچھے

ہمیں کہہ کے تم شرابی نہ کرو جہاں میں رسوا
کوئی رازِ دل چھپا ہے مری میکشی کے پیچھے

فاروق احمد
کلاس۔ بی اے (B.A)
رول نمبر: 325

"আমি চাই কথাগুলোকে
পায়ের উপর দাঁড় করাতে।
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটা ছায়ার।
আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি তা চাই না
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যেতে পারি।
আমি যেন আমার কলমটা
ট্রাক্টরের পাশে নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।"

COLLEGE LIBRARY

"Flow, softly flow, by lawn and lea
A rivulet then a river;
No where by thee my steps shall be,
For ever and for ever."